এমফিল থিসিস

গবেষণার শিরোনাম :

নির্বাচনী আইন ও মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন : নবম জাতীয় সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের উপর একটি সমীক্ষা।

তত্ত্বাবধায়ক :
ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ
প্রফেসর, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষক :
বায়েজিদ আহমেদ
লোক প্রশাসন বিভাগ
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২২৩, শিক্ষাবর্ষ: ২০০৮-০৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার শিরোনাম :

নির্বাচনী আইন ও মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন : নবম জাতীয় সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের উপর একটি সমীক্ষা।

গবেষক :
বায়েজিদ আহমেদ
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২২৩, শিক্ষাবর্ষ: ২০০৮-০৯
লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

এমফিল ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের লোক প্রশাসন বিভাগের অধীনে।

লোক প্রশাসন বিভাগ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
মার্চ ২০১৪

ঘোষণাপত্র

‘‘নির্বাচনী আইন ও মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন : নবম জাতীয় সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের উপর একটি সমীক্ষা’’-শীর্ষক এমফিল অভিসন্দর্ভটি আমার একটি মৌলিক রচনা। এ অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি এবং প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেয়া হয়নি।

বায়েজিদ আহমেদ
এমফিল গবেষক
লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

প্রত্যয়নপত্র

লোক প্রশাসন বিভাগের এমফিল গবেষক বায়েজিদ আহমেদ, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ ২২৩/২০০৮-০৯ কর্তৃক লিখিত ''নির্বাচনী আইন ও মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন : নবম জাতীয় সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের উপর একটি সমীক্ষা''-শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছে। আমার জানা মতে, উক্ত অভিসন্দর্ভটি কিংবা এর কোন অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ

প্রফেসর

লোক প্রশাসন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

অধ্যায় এক : ভূমিকা

১.১ সূচনা ১৬
১.২ নির্বাচনের পটভূমি ১৭
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ২০
১.৪ অনুসিদ্ধান্ত ২০
১.৫ গবেষণা অ্যাপ্রোচ ২০
১.৬ গবেষণা পদ্ধতি ২১
১.৭ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ২১
১.৭.১ প্রাইমারি পদ্ধতি ২১
১.৭.২ সেকেন্ডারি পদ্ধতি ২১
১.৮ তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ২২
১.৯ গবেষণা সীমাবদ্ধতা ২২

অধ্যায় দুই :

২.১ বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ ২৫
২.২ ব্রিটিশ আমল ২৫
২.২.১ ভারত শাসন আইন ২৬
২.২.২ ১৯৩৭ সাল থেকে জাতীয় নির্বাচনসমূহ ২৮
২.২.৩ ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ২৯
২.৩ পাকিস্তান আমল ৩২
২.৩.১ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ৩৩
২.৩.২ ১৯৫৯ সালে আইউব খানের অধীনে নির্বাচন ৩৫
২.৩.৩ ১৯৭০ সালের নির্বাচন ৩৭
২.৪ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৪০
২.৫ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৪২
২.৬ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৪৩
২.৭ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৪৫
২.৮ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৪৬
২.৯ ষষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৪৭
২.১০ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৪৮
২.১১ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৫০
২.১২ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৫১
২.১৩ নোয়াখালী-১ আসনে নির্বাচন স্থগিত ৫৭
২.১৪ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ৫৮
২.১৫ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পটভূমি ৬২
২.১৫.১ প্রথম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ৬২
২.১৫.২ দ্বিতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ৬৪
২.১৫.৩ তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ৬৪

অধ্যায় তিন : নির্বাচনী আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন : প্রেক্ষিত নবম সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

৩.১ নির্বাচনী আইন ও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন ৭৬

৩.২ ঢাকা-৬ সংসদীয় আসনের ইতিহাস ও নির্বাচন ৭৭

৩.৩ কেস স্টাডি : ঢাকা-৬ নির্বাচনী আসন ৮২

৩.৪ সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার ইতিহাস ও নির্বাচন ৮৮

৩.৫ কেস স্টাডি : বেলকুচি উপজেলা নির্বাচন ৯২

অধ্যায় চার : নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও নির্বাচন কমিশন : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

৪.১ ভূমিকা ১০৬

৪.২ নির্বাচন ১০৬

৪.৩ নির্বাচনী আইন ১০৭

৪.৪ নির্বাচনী আইনের প্রকারভেদ ১১০

৪.৫ নির্বাচনী আইনের গুরুত্ব ১১১

৪.৬ নির্বাচনী আইনের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন ১১২

৪.৭ নির্বাচন কমিশনের কাজ ১১২

৪.৭.১ নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ ১১২

৪.৭.২ ভোটার তালিকা প্রনয়ণ ১১৪

৪.৭.৩ ভোটার তালিকা সংশোধন ১১৫

৪.৭.৪ ভোটার তালিকা হালনাগাদ ১১৬

৪.৮ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের করণীয় কাজসমূহ ১১৭

৪.৮.১ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান ১১৯

৪.৮.২ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ১১৯

৪.৮.৩ প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারণ ১১৯

৪.৮.৪ হলফনামা ও ব্যক্তিগত তথ্যাদি প্রচার করা ১১৯

৪.৮.৫ প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া ১১৯

৪.৮.৬ নির্বাচনী ব্যয় ও উৎসের বিবরণী তুলে ধরা ১২০

৪.৮.৭ পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেয়া ১২০

৪.৮.৮ ভোটদান প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি ১২১

৪.৮.৯ নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্ট ১২২

৪.৮.১০ নির্বাচনী দ্রব্যাদির ব্যবহার ১২২

৪.৮.১১ ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ১২২

৪.৮.১২ ভোটগণনা ১২৩

৪.৮.১৩ প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল সংগ্রহ ১২৩

৪.৮.১৪ ফলাফল একত্রীকরণ ১২৩

৪.৮.১৫ নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা ও প্রকাশ ১২৪

৪.৮.১৬ নির্বাচনী সংক্রান্ত সরকারি অর্থব্যয়ের সমন্বয় সাধন ১২৪

৪.৮.১৭ নির্বাচনী কাগজপত্র সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ ১২৪

৪.৮.১৮ নির্বাচনী অপরাধ, দণ্ড ও প্রয়োগ পদ্ধতি ১২৪

৪.৮.১৯ নির্বাচনী বিরোধ ১২৫

৪.৮.২০ নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ১২৬

৪.৮.২১ বিবিধ ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

৪.৯ মাঠ প্রশাসন ১২৭
৪.১০ নির্বাচনী আইন বাস্তবায়নকারি কর্মকর্তারা ১২৭
৪.১০.১ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ ১২৭
৪.১০.২ রিটার্নিং ও সহকারি রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ১২৭
৪.১০.৩ রিটার্নিং ও সহকারি রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব ১২৮
৪.১০.৪ প্রিসাইডিং ও সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার ১৩০
৪.১০.৫ ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের অবস্থান ১৩০
৪.১০.৬ পোলিং অফিসার ১৩০
৪.১০.৭ মহিলা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ ১৩১
৪.১১ নির্বাচনী আইনের সংস্কার ১৩১
৪.১২ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ১৩১
৪.১৩ সিনিয়র সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের সঙ্গে আলোচনা ১৩২
৪.১৪ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ ১৩২
৪.১৫ ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ১৩৩
৪.১৬ সংলাপের জন্য রাজনৈতিক দল বাছাই ১৩৪
৪.১৭ সংলাপের জন্য দলগুলোকে চিঠি দেয়া ১৩৫
৪.১৮ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ ১৩৬
৪.১৯ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের প্রথমদফা সংলাপ ১৩৬
৪.২০ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের দ্বিতীয়দফা সংলাপ ১৩৭
৪.২১ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের তৃতীয়দফা সংলাপ ১৩৮
৪.২২ বিএনপিকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা ১৪০
৪.২৩ মানবতাবিরোধী অপরাধীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা ও দলের নিবন্ধন বাতিল দাবি ১৪২
৪.২৪ নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা ১৪৩
৪.২৫ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহারের উদ্যোগ ১৪৩
৪.২৬ রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ ভাগ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তের বিধান ১৪৪
৪.২৭ নবম সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচনী আইন ১৪৪
৪.২৮ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত ১৪৪
৪.২৯ গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮ ১৪৫
৪.৩০ সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮ ১৪৬
৪.৩১ নবম সংসদ নির্বাচনের আগে ইসি'র সঙ্গে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ ১৪৭
৪.৩২ জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ ১৪৯

অধ্যায় : পাঁচ
৫.১ ভূমিকা ১৫২
৫.২ গবেষণা ফলাফল ১৫২
৫.৩ তথ্য বিশ্লেষন ১৫২
৫.৪ বাংলাদেশে নির্বাচনী আইন বাস্তবায়নে বাধা ১৫৩
৫.৫ নির্বাচনী আইন বাস্তবায়নের সুপারিশ ১৫৪
৫.৬ উপসংহার ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সংযুক্তি

ব্রিটিশ আমলে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো ১৫৭
পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক দলসমূহ ১৫৭
এক নজরে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৫৯
প্রধান নির্বাচন কমিশনারদের সংখ্যা ও নামের তালিকা ১৫৯
নির্বাচন কমিশনারদের সংখ্যা, মেয়াদ ও তালিকা ১৬০

পরিশিষ্ট তালিকা :

পরিশিষ্ট-১ ১৬২

২০০৮ সালে নবম সংসদ নির্বাচনের আগে ইসি'র পক্ষ থেকে নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের জন্য প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন

পরিশিষ্ট-২ ১৬৭

বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেনের দায়ের করা মামলা

পরিশিষ্ট-৩ ১৬৯

মৎস্য ও পশু সম্পদমন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জ জেলা নির্বাচন অফিসার নীতিশ চন্দ্র দে'র দায়ের করা মামলা

পরিশিষ্ট-৪ ১৭০

নির্বাচনী রোডম্যাপ

পরিশিষ্ট-৫ ১৭২

কেস স্টাডিতে সাক্ষাতকার গ্রহণকারিদের তালিকা

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষা পরিচিতি

ইসিবি : ইলেকশন কমিশন অব বাংলাদেশ

সিইসি: চিফ ইলেকশন কমিশনার

আরপিও : রিপ্রেজেন্টেশন অব পিপল অর্ডার

আরও : রিটার্নিং অফিসার

এআরও : অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার

পিও : প্রিসাইডিং অফিসার

এপিও : অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিসাইডিং অফিসার

জানিপপ : জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ

এনডিআই : ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স

এএল : আওয়ামী লীগ

বিএনপি: বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি

কেপিপি : কৃষক প্রজা পার্টি

সিপিবি : কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ

ইভিএম : ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন

এনজিও : নন গভার্মেন্ট অর্গানাইজেশন

ইউএনডিপি : ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনস

সিডা : কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি

বিএমএ : বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন

এনআইএলজি : ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব লোকাল গর্ভমেন্ট

এলডিপি : লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি

আরএফইডি : রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি

পিডিপি : পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি

সারণির তালিকা

১. বঙ্গীয় আইনসভার বরাদ্দকৃত ২৫০ আসন

২. ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় আইনসভা নির্বাচনের ফলাফল

৩. ১৯৪৬ সালের আইনসভার নির্বাচন

৪. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন

৫. ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল

৬. ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল

৭. ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

৮. ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

৯. ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

১০. ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

১১. ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

১২. ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

১৩. ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

১৪. ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

১৫. ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম সংসদ নির্বাচনে দল ও প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা

১৬. নবম সংসদে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা

১৭. নবম সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনের তফসিল

১৮. নবম সংসদ নির্বাচনে স্থগিত হওয়া নোয়াখালী-১ আসনের তফসিল

১৯. নোয়াখালী-১ আসনের ফলাফল

২০. নবম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

২১. নবম সংসদ নির্বাচনের বিভাগওয়ারি ভোটের ফলাফল

২২. নবম সংসদ নির্বাচনের সংরক্ষিত মহিলা আসনের ফলাফল

২৩. জাতীয় সংসদের পর্যায়ক্রমিক ৯টি নির্বাচন

২৪. ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল

২৫. নবম সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনে প্রার্থী, রাজনৈতিক দল ও প্রতীক

২৬. নবম সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনে ভোটের ফলাফল

২৭. নির্বাচনী আইন সংস্কারের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ইসি'র প্রথমদফা সংলাপ

২৮. নির্বাচনী আইন সংস্কারের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ইসি'র দ্বিতীয়দফা সংলাপ

২৯. নির্বাচনী আইন সংস্কারের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ইসি'র তৃতীয়দফা সংলাপ

৩০. নির্বাচনী আইন সংস্কারের লক্ষ্যে বিএনপি'র সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ

৩১. নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো

৩২. জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বরাদ্দকৃত প্রতীক

৩৩. ব্রিটিশ আমলে সৃষ্টি ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো

৩৪. পাকিস্তান আমলে সৃষ্টি ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো

৩৫. এক নজরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলো

৩৬. প্রধান নির্বাচন কমিশনারদের সংখ্যা, নাম ও মেয়াদ

৩৭. নির্বাচন কমিশনারদের সংখ্যা, নাম ও মেয়াদ

৩৮. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী রোডম্যাপ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

''নির্বাচনী আইন ও মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন : নবম জাতীয় সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের উপর একটি সমীক্ষা''-শীর্ষক গবেষণার জন্য আমার গবেষণা কাজের তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ও জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ, জানিপপ-এর চেয়ারম্যান ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহর কাছে ঋণী। গবেষণা কাজটি করতে বিভিন্ন ধরনের দিক নির্দেশনার পাশাপাশি সব সময় গাইড করেছেন যিনি, সেই খ্যাতিমান স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদের প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। এছাড়া, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা, নির্বাচন কমিশনার মুহাম্মদ ছহুল হোসাইন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম সাখাওয়াত হোসেন এবং ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব লোকাল গর্ভমেন্ট, এনআইএলজি-এর মহাপরিচালক কবির মো. আশরাফ আলম নির্বাচনী আইন ও মাঠ পর্যায়ের প্রায়োগিক বিভিন্ন বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। গবেষণা কাজে সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও নিউএজ সম্পাদক নূরুল কবির। সবশেষ অপরিমেয় কৃতজ্ঞতা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ পরিচালক এস এম আসাদুজ্জামান আরজুর প্রতি; যিনি গবেষণাটি সম্পন্ন করতে সময়ে-অসময়ে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণায় চেষ্টা করেছি নবম জাতীয় সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের আগে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের যে সব আইন, বিধি-বিধান, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিধিমালা ও নির্বাচনী আচরণবিধি সংশোধনের ফলে আইনগুলো নির্বাচনকালীন মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা কিভাবে বাস্তবায়ন করেছেন সে বিষয়ে বর্ণনা দেয়ার। সর্বোপরি, নির্বাচনী আইনের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়নবিষয়ক এই গবেষণাটি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক কিংবা অন্যান্য গবেষণা কাজে ন্যূনতম রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগলে গবেষণা সার্থক বলে মনে করবো।

বায়েজিদ আহমেদ
২৯ মার্চ ২০১৪

সারসংক্ষেপ :

বর্তমানে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় নির্বাচন কেন্দ্রীক রাজনীতি মুখ্য হয়ে উঠেছে। জনগণের মতামতের প্রাধান্য দিতে গিয়ে মানুষকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর ইস্যুতে নির্বাচনের দ্বারস্থ হতে হয়। এটিই বর্তমান বিশ্বে মত প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা যেখানে ভোটের মাধ্যমে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ জন্যই মত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন বর্তমানে খুব জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি। এই নির্বাচনী পদ্ধতি বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়ে থাকে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের প্রতিফলন ঘটে ব্যালটের মাধ্যমে; আর এটি হলো নির্বাচন। নির্বাচন নানা কেন্দ্রীক হতে পারে; যেমন : ব্যক্তি কেন্দ্রীক, পরিবার কেন্দ্রীক, সমাজ কেন্দ্রীক, দল কেন্দ্রীক এমনকি রাষ্ট্র কেন্দ্রীক। নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষ তার পছন্দের ব্যক্তি কিংবা প্রতিনিধিকে বাছাই বা নির্বাচন করে। আর এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। বাংলাদেশে নির্বাচন নামক শব্দটি বেশি পরিচিতি পেয়ে আসছে সেই ১৯৯১ সাল থেকে। দেশ স্বাধীনের পর দু'বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শাসনতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত শাসন ব্যবস্থায় পদার্পন করে। যদিও ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে ১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত সময়ে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় যে সব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো নির্বাচন পদ্ধতি ও তার ফলাফলের প্রায় সবগুলোই তখন নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ ছিলো। ১৯৯০ সালে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে তিনদলীয় জোটের রুপরেখা তৈরী হয় এবং সে রুপরেখা অনুসরণ করে দল নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবির যৌক্তিক স্বীকৃতি লাভ করে। আন্দোলন-সংগ্রাম ও রক্তের বিনিময়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থায় ফিরে আসে বাংলাদেশ। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্যভাবে হয়। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচন বেশ অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। আর ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির (ঘোষণাকৃত) নির্বাচনের আগে দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভয়াবহ খারাপ হলে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আন্দোলনের অন্যতম দাবি হিসেবে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠিত হয় এবং পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. শামসুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন নতুন আইন-কানুন প্রবর্তন করে নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করে। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচনী আইন সংস্কারের উদ্যোগ নেয় নির্বাচন কমিশন। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের সংস্কার, নির্বাচনী আচরণবিধিমালা, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত ইত্যাদি বিষয়ে

নির্বাচন কমিশন সুশীল সমাজ, সিনিয়র সাংবাদিক ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে করে। পরে সবার মতামতের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আইনের সংস্কার করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেটি অধ্যাদেশ আকারে জারি করে। পরে ঐ আইন অনুযায়ী ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

নির্বাচনী আইন ও মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দু'টি কেস স্টাডি হিসেবে বেছে নিতে হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী নির্বাচনী যে সব আইন আছে সেগুলো যুগপোযুগি, তাৎপর্যমন্ডিত ও কার্যকর। বর্তমানে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী নির্বাচনী আইন, আচরণবিধি ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট। তবে অনেক সময় আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে আইনের কঠোর প্রয়োগ না থাকায় নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করতে দেখা গেছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের। গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা গেছে, নির্বাচনী আইন থাকলেও সেটি লঙ্ঘন করলে শাস্তি দেয়ার প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতাপূর্ণ। গবেষণার কেস স্টাডিতে দেখা গেছে, অনেক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর চাপে অনেক ঘটনায় স্বাক্ষী সাক্ষ্য দেয়ার সময় অনুপস্থিত থেকেছে। একটা সময় ছিলো যখন জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন মানেই সংঘাত, রক্তপাত, প্রাণহানি ঘটতো। ২০০৭-২০০৯ সময়ে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়। আগের নির্বাচনগুলোর তুলনায় নবম সংসদ নির্বাচনে বেশি ভোটার ভোট কেন্দ্রে শৃঙ্খলতার সঙ্গে ভোট দিয়েছে। যে কারণে ভোট দেয়ার হার ছিলো ৮৭.১৩ শতাংশ। ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ভোটের নিয়ম-কানুন বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রচার চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সভা, সেমিনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভোটারদের সচেতন করা হয়েছে। ফলে, ভোটাররা যেমন উৎসাহ নিয়ে কেন্দ্রে গেছে তেমনি জাল ভোট দেয়ার প্রবণতা কমেছে তুলনামূলকভাবে। নবম সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আইনের বাস্তবায়ন সুন্দরভাবে করতে পেরেছে নির্বাচন কমিশন। তবে জনবল বাড়ানো গেলে নির্বাচনী আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন আরো সুন্দরভাবে করা সম্ভব হতো। ভোটারদের মধ্যে আরো সচেতনতা তৈরী হলে নির্বাচনী আইনের বাস্তবায়ন পুরোপুরি সম্ভব হতো বলে গবেষণায় মনে হয়েছে। আর নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে। স্থানীয় মৎস্য ও পশুসম্পদমন্ত্রী লতিফ বিশ্বাস নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে মামলা পর্যন্ত হয়েছিলো তার বিরুদ্ধে। যদিও সাক্ষীর অভাবে সেই মামলা পরে বাতিল হয়ে গেছে। রাজনৈতিক দলের প্রভাবে অনেকেই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়নি। এদিকে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সংখ্যা আরো বাড়ানো গেলে নির্বাচনে অশুভ রাজনৈতিক প্রভাব ও পেশি শক্তির দাপট কমানো সম্ভব। সবশেষে বলা যায়, নির্বাচনী আইন মাঠ পর্যায়ে

বাস্তবায়ন অনেকাংশেই করা সম্ভব হয়েছে। তবে, আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা পরিহার করে সত্যিকার অর্থে আন্তরিকতা ও কঠোর আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নির্বাচনী আইন মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন সম্ভব। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি সমূহ হচ্ছে-কেস স্টাডি ও সাক্ষাতকার পদ্ধতি। এছাড়া, গবেষণায় দুই ধরনের তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় ধরনের তথ্য-উপাত্তের উৎস হচ্ছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস। প্রাথমিক তথ্যের উৎস হচ্ছে-প্রশ্নমালা দ্বারা সরাসরি উত্তর দাতাদের সাক্ষাতকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য। আর মাধ্যমিক তথ্যের উৎস হচ্ছে–জার্নাল, প্রতিবেদন বই, পত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশনের রিপোর্ট। গবেষণায় যে সব সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা গেছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো–নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রভাব, নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দক্ষ জনবলের অভাব, দীর্ঘ আইনী প্রক্রিয়া, জনসাধারণের সচেতনতার অভাব, নির্বাচনে কালো টাকা ও পেশি শক্তির প্রভাব, কঠোর আইন না থাকায় আইন ভাঙ্গার প্রবণতা, কম সংখ্যক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সংখ্যা, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের দ্রুত, কার্যকর ও সময়োপযোগি সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা, কলোনিয়াল মানসিকতা ও সর্বোপরি আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির অভাব।

অধ্যায় এক : ভূমিকা

১.১ সূচনা :

যে কোন দেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন অপরিহার্য। অন্যদিকে, নির্বাচন একটি রাজনৈতিক কর্মকান্ডও বটে। 'নির্বাচন' নামক এই রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অসংখ্য আইন-কানুন থাকলেও রাজনৈতিক বাস্তবতায় অনেক সময় তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়না। এর ফলে, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নির্বাচনী ব্যবস্থা ও নির্বাচনী ফলাফল প্রায়ই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ইতিহাসের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

এদেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গণতান্ত্রিকভাবে হস্তান্তরের ইতিহাস সূচনা হয় ১৯১৯ সালে প্রবর্তিত 'গর্ভমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' বা 'ভারত শাসন আইন'-এর মাধ্যমে। ১৯৩৫ সালে ইংরেজ শাসনামলে ভারতবর্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আইন পরিষদ গঠনের বিধান করা হয় ঐ অ্যাক্টের দ্বারা। অবিভক্ত বাংলায় ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে ২৫০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পায় ৬০টি আসন, মুসলিম লীগ ৪০টি, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি, কেপিপি ৩৫টি, স্বতন্ত্র মুসলিমরা ৪১টি, স্বতন্ত্র হিন্দুরা ১৪টি, স্বতন্ত্র তফসিলী সম্প্রদায় ২৩টি, ইউরোপিয়রা ২৫টি, অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা ৪টি আর স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পায় ৮টি আসন। ২৫০ আসনের মধ্যে ৮০টি ছিলো সাধারণ আসন, ১১৯টি মুসলমানদের জন্য, ১৭টি ইউরোপিয়দের জন্য এবং বাকি ৩৪টি আসন ইন্টারেস্ট গ্রুপের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিলো।[১] প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আইন পরিষদ নির্বাচনের পর কৃষক প্রজা পার্টির নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকারের চক্রান্তে ১৯৪৩ সালের ২৯ মার্চ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। পরে ইংরেজ সরকার ঢাকার মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমউদ্দিনকে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় ও শেষ আইনসভার নির্বাচনে আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত ছিলো। প্রাদেশিক পরিষদের ঐ নির্বাচনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন; ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট ভারত বিভাগ হওয়ার দিন পর্যন্ত তিনি ঐ দায়িত্বে ছিলেন। দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলা পাকিস্তান অংশ হওয়ায় এর নামকরণ হয় পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী ও মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীদের অত্যাচার ও নির্যাতনের জবাব ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দেয় পূর্ব পাকিস্তান জনগণ। ঐ নির্বাচনে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা নির্বাচনী জোট যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় যায় আর শোচনীয় পরাজয় ঘটে মুসলিম লীগের। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান ও মুসলিম লীগের নেতাদের ষড়যন্ত্রে

বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকার। ক্ষমতার পালাবদলে ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জাকে হটিয়ে জেনারেল আইউব খান পাকিস্তান ক্ষমতা দখল করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে ১৯৫৯ সালে নির্বাচনের আয়োজন করেন আইউব খান। 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে অভিহিত করে পাকিস্তান দুই অংশে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে দেশের নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হয়।[২] এদের দ্বারা পাকিস্তান রাষ্ট্রপতি, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়; যেটি তখন সমগ্র পাকিস্তানে সমালোচনার ঝড় তোলে। এদিকে, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে পাকিস্তান নির্যাতন, নিষ্পেষনের জবাব দেয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বাধীকার আন্দোলনের পক্ষে নিরঙ্কুশ সমর্থন দান করে। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন রাজনৈতিক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন জিয়াউর রহমানের শামরিক শাসনামলে, তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ নির্বাচন ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে এরশাদের সামরিক শাসনামলে অনুষ্ঠিত হয়। ঐসব নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরপর এরশাদের ৯ বছরের ৮ মাস সময়ের সামরিক শাসনামলের অবসানের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও পদ্ধতিতে পঞ্চম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা এবং মত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সূচনা হয়।

১.২ নির্বাচনের পটভূমি :

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার অগ্রযাত্রা হিসেবে ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেই ধরা হয়। এই নির্বাচন বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। যদিও গণতান্ত্রিক পরিবেশের নির্বাচনের জন্য এদেশের মানুষকে দীর্ঘদিন আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে; দিতে হয়েছে প্রাণ বিসর্জন। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগের মাধ্যমে দীর্ঘ ৯ বছর ৮ মাসের সামরিক শাসনের অবসান হয়। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেকে চিফ মার্শাল ল্ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ঘোষণা করেন এবং বিচারপতি এ এফ এম আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি বানান। পরের বছর ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অর্জন করেন। এরশাদকে ক্ষমতা থেকে সরাতে তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলো যুগপথ আন্দোলন শুরু করে ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। প্রায় ৮ বছর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন চলে। এরশাদবিরোধী

আন্দোলনে বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রীয় সমর্থনপুষ্ট সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর ও জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের দ্বারা অসংখ্য আন্দোলনকারি নিহত হন। এদের মধ্যে জয়নাল, জাফর, দিপালী, আইউব, ফারুক, কাঞ্চন, মোজাম্মেল হোসেন, জাফর, ইব্রাহিম সেলিম, দেলোয়ার হোসেন, শাহজাহান সিরাজ, রাউফুন বসুনিয়া, আবুল ফাত্তাহ, বাবলু অন্যতম।[৩] এছাড়া, শ্রমিক নেতা শামসুল আলম, তাজুল ইসলাম এবং সাংবাদিক গোলাম মাজেদসহ নাম না জানা অসংখ্য গণতন্ত্রকামি মানুষ মারা যান এরশাদবিরোধী আন্দোলনে।[৪] এমনকি ''স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক'' শ্লোগান বুকে ও পিঠে লিখে মিছিলে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা যান নূর হোসেন।[৫] ১৯৯০ সালের নভেম্বরে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে আটদলীয়, সাতদলীয় ও পাঁচদলীয় জোট ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনৈতিক রুপরেখা ঘোষণা করে।[৬] জোটের দাবির মধ্যে অন্যতম ছিলো :

১. রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করে একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করলেই বিরোধী জোট নির্বাচনে অংশ নেবে।

২. সংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রপতি একজন নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দেবেন এবং ঐ উপ-রাষ্ট্রপতি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করবেন।

৩. অন্তবর্তীকালীন সরকারের কোন উপদেষ্টা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না এবং একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা করবেন।

৪. প্রশাসনে সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. গণমাধ্যমসমূহকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখতে হবে।

যদিও রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ সে সময় বিরোধী দলের রাজনৈতিক এই রুপরেখাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে তা প্রত্যাখ্যান করলে সরকার পতনের আন্দোলন আরো তীব্র রুপ ধারণ করে। এদিকে, ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র সামনে আন্দোলনকারিদের মিছিলে পুলিশ গুলি করলে বিএমএ নেতা ডা. শামসুল আলম খান মিলন নিহত হন।[৭] প্রতিবাদে সারাদেশে জনগণ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে রাস্তায় নেমে আসে; অচল করে দেয় সারা দেশ। জরুরি আইন জারি করে মিছিল-মিটিং, সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কার্ফু জারি করে এরশাদ সরকার। ২৮ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এরশাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থান চলে।[৮] আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে তৎকালীন বিরোধীদলীয় জোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির মুখে ৬ ডিসেম্বর মওদুদ আহমদ উপ-রাষ্ট্রপতি থেকে পদত্যাগ করেন এবং তিন জোটের মনোনিতো ব্যক্তি হিসেবে সে সময়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দেন। ঐ দিন অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বরে এরশাদ সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে ৯ বছর ৮ মাসের স্বৈরাচারী শাসনের ইতি

Dhaka University Institutional Repository

টানেন।[৯] বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি (শাসনতান্ত্রিক প্রধান) এর দায়িত্ব পালন করেন।[১০] ৮ ডিসেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি একটি উপদেষ্টামন্ডলী গঠন করেন ও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৯১ সালের ৯ অক্টোবর পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন।[১১]প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ১৯৯১ সালের ৯ ডিসেম্বর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ শপথ নেয়ার মাধ্যমে দেশের শাসন ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, যে ব্যবস্থার শাসনতান্ত্রিক নাম দেয়া হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা; এর ইংরেজি নাম Caretaker Government of Bangladesh। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনের পর থেকে দেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থায় গুনগত পরিবর্তন আসে। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ সালের ১২ জুন ও ২০০১ সালের ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। যদিও ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিএনপি সরকারের অধীনে দেশে ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন হয়। ঐ নির্বাচনে প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, বাম দলগুলোসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে। এক তরফার ঐ নির্বাচন দেশে ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে গ্রহণযোগ্য হয়নি। একটি কথা বলা দরকার যে, বাংলাদেশ স্বাধীনের পর থেকে প্রায় প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনে পরাজিত বড় ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল এক ধরনের রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছে ও নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনেছে। এদিকে, ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি নবম সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা, নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত কর্মকান্ড এবং রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম রাজনৈতিকভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হয়; দেশ এক অনিবার্য রাজনৈতিক সংঘাতময় অবস্থার দিকে চলে যায়। দেশের ঐ ক্রান্তিকালে অর্থাৎ ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং জরুরি অবস্থা জারি করেন। ১২ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদ ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে নিয়োগ দেন। তার নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর দেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেন। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে ছিলো : নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আলাদা করে স্বাধীন করা, নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা, নির্বাচনী বিভিন্ন আইনের সংস্কার করা, রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আনা। এই সংস্কার কার্যক্রমের ফলে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর দেশে শান্তিপূর্ণভাবে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যা দেশে-বিদেশে প্রায় সব মহলে ব্যাপক প্রশংসা পাওয়ার পাশাপাশি গ্রহণযোগ্য হয়। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবেও বিবেচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য :

আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নির্বাচনী আইনের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা। মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। উদ্দেশ্যগুলো হলো :

১. স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান আহরণ করা।
২. একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নির্বাচনে আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন কতটা হয়েছে সেটির প্রকৃত চিত্র গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরা।
৩. জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের সময় মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তারা নির্বাচনী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া।
৪. নির্বাচনী আইন মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধাগুলো কি কি।
৫. নির্বাচনী আইন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া।
৬. নির্বাচনী আইন বাস্তবায়নের ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা, তৃণমূল পর্যায় থেকে নেতৃত্ব নির্বাচন, কালো টাকা ও পেশি শক্তির অবসান হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ।

১.৪ অনুসিদ্ধান্ত :

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ও সকল নির্বাচনী আইন জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে, এটি এই গবেষণার অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচ্য।

১.৫ গবেষণা অ্যাপ্রোচ :

তথ্য উপাত্তের ধরন ও প্রকৃতি অনুসারে এই গবেষণাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে গবেষণার গুনাত্বক (কোয়ালিটিটিভ) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কেননা, এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্তসমূহ সংখ্যা দ্বারা উপস্থাপন করা হয়নি; বরং তথ্যগুলো বিশ্লেষণাত্বকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি :

এই গবেষণার ক্ষেত্রে যে সব গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে তা হলো :

১. সাক্ষাতকার ও

২. কেস স্টাডি।

১. সাক্ষাতকার : গবেষণায় উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে কাঠামোগত সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে।

২. কেস স্টাডি : জাতীয় ও উপজেলা নির্বাচনের নির্দিষ্ট গবেষণা এলাকায় নির্বাচনী আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে জানতে এই গবেষণায় কেস স্টাডি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

১.৭ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি :

গবেষণায় দু'টি উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে :

- প্রাইমারি পদ্ধতি ও
- সেকেন্ডারি পদ্ধতি।

১.৭.১ প্রাইমারি পদ্ধতি :

গবেষণাটি করতে গিয়ে প্রাথমিক তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। নির্বাচনী আইন বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, নির্বাচনের প্রার্থী, রিটার্নিং অফিসার, পোলিং অফিসার, পর্যবেক্ষক, সাংবাদিক, শিক্ষক, সরকারি আমলা, রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সাক্ষাতকার নেয়ার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ছাড়া, গবেষণায় কেস স্টাডির সহযোগিতা নেয়া হয়েছে; যেখানে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের নির্বাচনী আইন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট রা কি ধরনের কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলা ভাষায় কাঠামোবদ্ধ (ইংরেজিতে বলা হয় ওপেন এন্ডেড) অনুসূচি নিয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৭.২ সেকেন্ডারি পদ্ধতি :

নির্বাচনী আইনের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নি, নবম জাতীয় সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে রেডিও, টেলিভিশন, দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন নিউজ এজেন্সি ও ওয়েব সাইটে প্রচারিত রিপোর্ট, আর্টিকেল ও ফিচার। এছাড়া, অসংখ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বই, সাময়িকীসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের সাহায্য নেয়া হয়েছে গবেষণায়।

১.৮ তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি :

মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী যথাযথভাবে সংগ্রহের পর সেগুলো বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া, গবেষণার ফলাফল আরো আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে গ্রাফিক্স ব্যবহার করা হয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে গবেষণার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য সাধন, ধারনাসমূহের সাধারণীকরণ ও প্রাপ্ত ফলাফলসহ একটি প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। এরপর চূড়ান্তভাবে বিন্যাস করে তা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট স্থানে বিতরণ করা হবে।

কেস স্টাডি :

গবেষণায় কেস স্টাডি মেথড বেছে নেয়ার কারণ হলো-এই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচনী আইন মাঠ পর্যায়ে কতটা বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেটা বের করে আনতে সহায়তা করেছে। অন্যদিকে, এই গবেষণার বিভিন্ন সমস্যা বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির সরাসরি সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সাক্ষাতকার প্রদানকারি ব্যক্তির মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত ঝামেলা বা অন্যান্য অসুবিধা থাকায় তাদের সাক্ষাতকার সরাসরি নেয়া সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে টেলিফোনের মাধ্যমে ঐ সব ব্যক্তির সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারি প্রার্থী, রিটার্নিং অফিসার, জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা, প্রিসাইডিং অফিসার, সিনিয়র সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক, দায়িত্বশীল সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী কর্মকর্তা ও স্থানীয় ভোটারদের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে।

সমগ্রক ও নমুনায়ন (পপুলেশন এন্ড স্যাম্পল) :

এই গবেষণাটিতে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেমন : প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী কর্মকর্তা, রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, স্থানীয় সাংবাদিক ও ভোটার। এখানে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে সমগ্রকের মধ্য থেকে মোট ২৮ জনের নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। এই ২৮ জনই গবেষণার নমুনার আকার, যারা প্রত্যেকটি শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছে।

১.৯ গবেষণার সীমাবদ্ধতা :

গবেষণাটি করতে গিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করতে হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো :

১. স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল বিষয় বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষাতকার দিতে অপরাগতা প্রকাশ করেছে; অনেক সময় নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে দিনের পর দিন ঘুরিয়েছে। সময় নষ্টের মাধ্যমে সাক্ষাতকার দেয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা করেছে।

২. সাক্ষাতকারের বিষয় ফৌজদারি প্রকৃতির বলে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষাতকার দিতে অনিহা প্রকাশ করেছেন।

৩. একটি গবেষণা কাজ সুষ্ঠু, সঠিক ও নির্ভুলভাবে সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু এই গবেষণায় কোন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া যায়নি বলে গবেষকের ব্যক্তি উদ্যোগে গবেষণার প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেয়া কষ্টকর হয়েছে।

৪. গবেষণার ক্ষেত্রটি নতুন বিধায় আগের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাহিত্য, সাময়িকী, জার্নাল, গবেষণা প্রবন্ধ ও সংশ্লিষ্ট বইয়ের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এ কারণেই গবেষণার ক্ষেত্রে এর তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সাহিত্য পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়নি; যা এই গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা।

তথ্য নির্দেশ :

১. বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ (১৮৬১-২০০৭), হারুন-অর-রশিদ, হাসিনা প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭।

২. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, তারিক হোসেন খান, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৬।

৩. বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস এরশাদের সময়কাল, ড. মোহাম্মদ হাননান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা ২১০-২১১।

৪. ঢাকার বাইরে সাংবাদিকতা, সম্পাদনায় মো: সাজ্জাদ হোসেন ও আজফার আজিজ, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি), ঢাকা, নভেম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা ৩১ ও ৩২।

৫. বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস এরশাদের সময়কাল, ড. মোহাম্মদ হাননান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা ৯২-৯৩।

৬. বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ড. আবুল ফজল হক, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০,
পৃষ্ঠা ১৯৮-১৯৯।

৭. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, তারিক হোসেন খান, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ২৫৯।

৮. বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), ড. হারুন-অর-রশীদ, নিউএজ পাবলিকেন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ৩৬৬।

৯. বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ড. আবুল ফজল হক, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০,পৃষ্ঠা ১৯৯।

১০. বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ড. আবুল ফজল হক, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০,পৃষ্ঠা ১৯৯।

১১. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, তারিক হোসেন খান, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬১।

অধ্যায় : দুই

২.১ বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ :

নির্বাচনী ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনার আগে বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সূর্য অস্তমিত হয়; সেই থেকে বাংলায় পরাজয়ের ইতিহাস শুরু।

২.২ ব্রিটিশ আমল :

মূলতঃ ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ইংরেজরা বাংলায় শাসন ও নিষ্পেষন ইতিহাস গড়তে শুরু করে। অত্যাচারের মাত্রা প্রতিদ্বন্দ্বী বেড়ে যাওয়ায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয় নির্যাতিত ভারতীয়রা; শুরু হয় স্বদেশি আন্দোলন। এই সময় ব্রিটিশ পণ্য পরিহার করে দেশিয় পণ্য ব্যবহারে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে, বাড়তে থাকে গণসচেতনতা। এক পর্যায়ে শুরু হয় স্বদেশি আন্দোলন। ১৭৭১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ফকির মজনু শাহ শুরু করেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন। মজনু শাহের বিদ্রোহ পরিচিতি পায় 'ফকির সন্নাসী বিদ্রোহ' (১৭৬৩-১৮০০) নামে।[১]

এদিকে, ত্রিপুরা জেলার শমসের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭০-৮৭), সৈয়দ মীর নেসার আলী তিতুমীরের (১৭৮২-১৮৩১) নেতৃত্বে 'বাঁশের কেল্লা' বিদ্রোহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের অনাস্থা ও প্রতিবাদ।[২] কম যায়নি নীলচাষিরাও; ইংরেজদের বিরুদ্ধে নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০) করে দেখিয়ে দিয়েছে অন্যায় আর শোষনের দাতভাঙ্গা জবাব কিভাবে দিতে হয়। ১৮৫৭ সালের ১০ মে ভারতের শেষ স্বাধীন মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নেতৃত্বে শুরু হওয়া 'সিপাহী বিদ্রোহ' তো ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন হিসেবে।[৩] আর হাজী শরিয়তউল্লাহর নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন ও সূর্যসেনের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে সংঘটিত 'চট্টগ্রাম বিপ্লব' দ্যুতি ছড়িয়েছে আপন আভায়।[৪]

এছাড়া, মধু ও কানুর নেতৃত্ব ১৮৫৫ সালের প্রায় ৩০ হাজার সাওতালদের প্রতিরোধ 'সাওতাল বিদ্রোহ' নামে পরিচিতি পেয়েছে।

সবশেষ স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজদের অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের প্রতিবাদ জানিয়ে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করেছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু।[৫] ইংরেজরা যখন বুঝতে পারে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের আন্দোলনে ভারতীয়রা একনিষ্ঠ, তখন ভারতীয় জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে

ইংরেজরা ইন্ডিয়া অ্যাক্ট বা 'ভারত শাসন আইন-১৯৩৫'-এর মাধ্যমে গণতন্ত্র ও নির্বাচনী ব্যবস্থার যাত্রা শুরু করে।[৬] ব্রিটিশদের শোষনের ঠিক ১৮০ বছরের মাথায় তাদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে ভারতে নির্বাচনী ব্যবস্থার উদ্ভব হয়; যুক্ত হয় নতুন ইতিহাস। ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন ও আইন পরিষদ গঠনের বিধানও রচিত হয় ঐ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের (১৯৩৫) মাধ্যমে। ঐতিহাসিক সেই আইনে ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ২৫০ সদস্যবিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠিত হয়, শুরু হয় নির্বাচনী ব্যবস্থার পথচলা। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন ও আইন পরিষদ নির্বাচনের পর ক্ষমতায় আসেন শেরে বাংলা ফজলুল হক।[৭] শেরে বাংলার নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশদের চক্রান্তে ১৯৪৩ সালে ঐ মন্ত্রিসভার অবসান ঘটান তৎকালীন পাকিস্তানে গভর্নর। আর ইংরেজ সরকার তাদের আস্থাবান মুসলিম লীগ নেতা ও ঢাকার রাজ পরিবারের সদস্য খাজা নাজিমউদ্দিনকে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয় ১৯৪৭ সালে। দ্বিতীয় ও শেষ আইনসভার আসন সংখ্যা আগের মতোই ২৫০ থাকে। ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়ে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।[৮] ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট ভারত বিভাগ হওয়ার দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলার সবশেষ মুখ্যমন্ত্রী।

১৯৪৭-সালে দ্বি জাতি তত্ত্বের ভারত থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্র আলাদা হওয়ার পর সাবেক পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) পাকিস্তানে একটি প্রদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) নামে রুপ নেয়। ঐ সময় খাজা নাজিমউদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের নেতা থাকায় পাকিস্তান সরকার তাকে পূর্ব পাকিস্তানে (পূর্ব বাংলা) মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়।[৯] ভারত বিভাগের আগে পূর্ব বাংলা থেকে অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়া সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলার প্রথম আইন পরিষদ। পূর্ব বাংলায় আইন পরিষদ গঠনের জন্য প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে। এই নির্বাচনে পরাক্রমশালী ও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় যুক্তফ্রন্ট্রের কাছে। এমনকি পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন যুক্তফ্রন্টের এক ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজের কাছে নির্বাচনে হেরে যান। ফলে, পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান মুসলিম লীগ শাসনের অবসান ঘটে। এ নির্বাচন সংশোধিত গর্ভমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের (১৯৩৫) অধীনে অনুষ্ঠিত হয়।[১০]

২.২.১ ভারত শাসন আইন : ১৯১৯ সালের আইন ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কংগ্রেস ১৯১৯ সালের সংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ১৯২০ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে অংশ নেয়নি। অনেক মুসলিম নেতার সে সময় এই আইনটির বিরোধীতা করেন। মোট কথা ভারতীয়রা তাদের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দাবি তোলেন। এই দাবির প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ সালে স্যার সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে; কমিশনের দায়িত্ব ছিলো ১৯১৯ সালের আইনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা এবং ভারতের জন্য একটি নতুন

সংবিধানের সুপারিশ করা। সাইমন কমিশন যে সব সুপারিশ করেন তাতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগাররা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত লন্ডনে ৩টি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সব বৈঠকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যৌথ কমিটি কতগুলো প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রস্তাবগুলোর ভিত্তিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন গৃহীত হয়। ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্টগুলো নিম্নরুপ :

১. ভারতে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব। এতে সব প্রদেশ ও যোগদানে ইচ্ছুক দেশিয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনা করা হয়।

২. শাসন বিষয়সমূহকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয় : কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও যুগ্ম বিষয়। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত করা হয়। যুগ্ম বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকার কর্তৃত্ব কর্তৃত্ব দেখাতে পারতো। অন্যদিকে, যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বিরোধীতা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিতো।

৩. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়। প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়গুলোর ওপর প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়।

৪. ভারত শাসন আইনে একজন প্রধান বিচারপতি ও কয়েকজন সিনিয়র বিচারক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠনের ব্যবস্থা ছিলো। এ আদালতের কাজ ছিলো শাসনতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেয়া এবং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলোর মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করা।

৫. ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ক্ষমতা একজন গর্ভনর জেনারেলের হাতে ন্যাস্ত করা হয়, যিনি ইংল্যান্ডের রাজার বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

৬. ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটে।

৭. কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার প্রনয়ণ করা হয়। উচ্চ কক্ষের নাম ছিলো রাজ্যসভা, যার সদস্য সংখ্যা ছিলো ২৬০ জন। (১৫৬ জন ব্রিটিশ ভারতের এবং ১০৪ জন দেশিয় রাজ্যের প্রতিনিধি। অন্যদিকে, নিম্ন কক্ষের নাম ছিলো যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ, যার সদস্য সংখ্যা ছিলো ৩৭৫ জন (২৫০ জন ব্রিটিশ ভারতের এবং ১২৫ জন দেশিয় রাজ্যেগুলোর প্রতিনিধি)।

৮. প্রদেশের প্রধানের নাম ছিলো গভর্নর; তাকে সহযোগিতার জন্য ছিলো মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতো।

৯. কেন্দ্রীয় আইনসভার এক তৃতীয়াংশ মুসলিম প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয় এবং আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

১০. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সংশোধন করার পূর্ণ ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে ছিলো। এ ব্যাপারে ভারতের আইনসভাকে কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি। এ আইনে ভারত সচিবের ক্ষমতা কিছুটা কমানো হলেও তিনি নানাভাবে ভারত সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন।

১১. বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসাম প্রদেশে দ্বি কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা এবং অন্যান্য প্রদেশে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ছিলো। ভারত হতে ব্রহ্মদেশকে আলাদা করা হয় এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসহ নতুন দুই প্রদেশকে অন্যান্য প্রদেশের সমান মর্যাদা দেয়া হয়।[১১]

২.২.২ ১৯৩৭ সাল থেকে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনসমূহ :

১৯৩৫ সালের গর্ভমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের মাধ্যমে বাংলা ও আরো কয়েকটি প্রদেশে দ্বি কক্ষবিশিষ্ট আইন প্রনয়ণকারী পরিষদের বিধান রাখা হয়। ৬২ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চকক্ষে প্রাদেশিক গভর্নর ও আইনসভা কতৃক মনোনিতো হবেন যথাক্রমে ৫ জন ও ২৭ জন সদস্য, বাকিরা নির্বাচিত হবেন। নির্বাচনী আসনগুলোর বন্টন ছিলো এ রকম :

সাধারণ শহরে : ২ জন
গ্রামীণ এলাকায় : ৮ জন
মুসলিম শহুরে : ১ জন
মুসলিম গ্রামীণ এলাকায় : ১৬ জন এবং

ইউরোপিয় : ৩ জন।

নিম্নকক্ষ অর্থাৎ প্রাদেশিক আইনসভা ছিলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী। মন্ত্রিসভাকে এ পরিষদের কাছে জবাবদিহি করতে হতো। বাংলায় এ পরিষদের সদস্য ছিলো ২৫০ জন।[১২]

এর আসন বন্টন ছিলো নিম্নরুপ :

মুসলিম : ১১৭টি

হিন্দু: ৪৮টি

তফসিলী হিন্দু : ৩০টি এবং

বিশেষ আসন : ৫৫টি।

নির্বাচনের পর মুখ্যমন্ত্রী হন কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি শেরে বাংলা একে ফজলুল হক। অধিবেশন বসে ১৯৩৭ সালের ৭ এপ্রিল। প্রথম স্পিকার হন স্যার আজিজুল হক এবং পরে সৈয়দ নওশের আলী। অন্যদিকে, ডেপুটি স্পিকার হন এম আশরাফ আলী এবং পরে সৈয়দ জালালউদ্দিন হাসমী।

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৩ ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন :

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগ অর্জন করে ১১৪টি আসন। স্যার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ-এর হাতে গড়া দলটি যেখানে মুসলিম নির্বাচনী এলাকা থেকে ১৯৩৭ সালে দলটি পেয়েছিলো ৩৯টি আসন।[১৩] নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৪টি বিশেষ আসন ও শহরের ৬টি আসনের সবগুলোতে এবং ১১১টি গ্রামীণ আসনের ১০৪টিতে জয়ী হয়। কৃষক প্রজা পার্টি-কেপিপি ১৯৩৭ সালে যেখানে ৩৫টি আসনে বিজয়ী হয়েছিলো সেখানে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে দলটি বিজয়ী হয় মাত্র ৪টি আসনে। অন্যদিকে, এমারত পার্টি ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২টি আসনে বিজয়ী হয়। মুসলিম নির্বাচনী এলাকায় অন্য কোন দল কোনো আসন পায়নি। মোট ভোটের ৮৩.৬৪ শতাংশ পায় মুসলিম লীগ আর কেপিপি পায় মাত্র ৫.৩৯ শতাংশ। অবশ্য কৃষক প্রজা পার্টির নেতা একে ফজলুল হক ২টি আসনে জয়লাভ করেন। মুসলিম লীগ বিরোধীদের ৭৬.২১ শতাংশেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয় ঐ নির্বাচনে। মুসলিম লীগের ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার ছিলো নির্বাচনের আগে। ঐ সময় দলটির অসংখ্য পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড গ্রামাঞ্চলে দেখা গেছে। নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন রকমের জনপ্রিয় শ্লোগান। যেমন : ''লাঙ্গল যার, জমি তার'', ''ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদারি উচ্ছেদ কর'', ''কায়েমী স্বার্থ নিপাত যাক'', ''মজুর হবে মালিক'', ''পাকিস্তান কৃষক আর শ্রমিকের জন্য'' ইত্যাদি। মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা 'মিল্লাত' এ বলা হয় মুসলিম লীগের দাবি মতে, যদি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে সর্বহারা মুক্তি পাবে এবং সব ধরনের কায়েমী স্বার্থ নিপাত যাবে। এ পত্রিকায় আরো দাবি করা হয় যে, নির্বাচিত হলে নির্বাচিত হলে মুসলিম লীগ সার্বিকভাবে কৃষিতে সংস্কার করবে, খাদ্য সংকটের সমাধান করবে, পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবে, প্রধান ও বড় শিল্প কারখানাগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করবে; ঘটাবে কুটির শিল্পের বিকাশ।[১৪]

এদিকে, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার পাশাপাশি বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার করবে বলেও নির্বাচনের আহে প্রতিশ্রুতি দেয় দলটি। মূলতঃ আদমজি, ইস্পাহানি, মেমন, খোজা ও বোহারাদের কাছ থেকে মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারাভিযানের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা হয়। প্রাদেশিক মুসলিম চেম্বার অব কমার্স এবং বণিক সমিতিসমূহ মুসলিম লীগের নির্বাচনী তহবিলে অর্থ সহায়তা দেয়। এছাড়া, গরিব মুসলমানরাও কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র তহবিলে অর্থ দান করে। নির্বাচনসংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় মেটানোর পরেও জিন্নাহ'র কাছে ৪০ লাখ রুপি উদ্বৃত্ত হিসেবে তহবিলে জমা হয়েছিলো। মুসলিম লীগ নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের সময়ে ব্যাপকভাবে তহবিল সংগ্রহ অভিযান চালায়। প্রায় হাজার বিশেক ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী ঐ নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশ নেয়। কলকাতা ও ঢাকায় ছাত্রদের ব্যাপকভাবে নির্বাচনী প্রচার বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্যামফ্লেট, পোস্টার ও লিফলেট বিতরণের পাশাপাশি বক্তারা বিশাল জনসমাবেশে বক্তব্য দেন। নির্বাচনে জামাতুল উলেমা-ই-ইসলামের

ব্যানারে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ করেন। এদিকে, বাঙালি মুসলিম ভোটারদের কাছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি খুব জনপ্রিয় ছিলো। পাকিস্তান নামক একটি স্বপ্নের দেশ পাওয়ার আশায় তারা মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করে। নির্বাচনী প্রচারে মুসলিম লীগাররা ছিলেন জবরদস্ত ও অতি উৎসাহী। লীগের সমর্থক প্রভাবশালী ‘দৈনিক আজাদ’ মুসলিম লীগের পক্ষে সংবাদ প্রচার করে। নির্বাচনে বিজয়ের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের ২৩ এপ্রিল মন্ত্রিসভা গঠন করে মুসলিম লীগ।[১৫]

সারণি : ১

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী বঙ্গীয় আইন সভার ২৫০ আসনের বরাদ্দ ছিলো এরুপ :

ক্রমিক নং	নাম	আসন সংখ্যা
১	জমিদারদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	৫টি
২	শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত সংখ্যা আসন	৮টি
৩	মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	৫টি
৪	বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের জন্য আসন সংখ্যা	১৪টি
৫	বাণিজ্য ক্ষেত্রে হিন্দুদের জন্য আসন সংখ্যা	৪টি
৬	বাণিজ্য ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য আসন সংখ্যা	১টি
৭	সাধারণ আসন (শহর)	১২টি
৮	সাধারণ আসন (গ্রাম)	৩৬টি
৯	মুসলমান আসন (গ্রাম)	১১১টি
১০	তফসিলি (নিম্নজাত হিন্দু)	৩০টি
১১	ইউরোপিয়	১১টি
১২	খ্রিস্টান	২টি
১৩	অ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৩টি
	সর্বমোট	২৫০টি আসন

সূত্র : বাঙালির ইতিহাস (প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত), ড. মোহাম্মদ হাননান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২।

সারণি ২ :

১৯৩৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় আইনসভার (বেঙ্গল রেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি) সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল :

রাজনৈতিক দল	আসন সংখ্যা
কংগ্রেস	৬০
মুসলিম লীগ	৪০
কৃষক প্রজা পার্টি	৩৬
স্বতন্ত্র মুসলমান	৪১
স্বতন্ত্র হিন্দু	১৪
স্বতন্ত্র তফসিলী সম্প্রদায়	২৩
ইউরোপীয়	২৫
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৪
স্বতন্ত্র অতিরিক্ত আসন	৮

সূত্র : বাংলাদেশ নবম জাতীয় সংসদ ২০০৯-২০১৪, আব্দুর রব, শিকদার, আগন্তুক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২।

সারণি : ৩

১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল :

রাজনৈতিক দল	আসন সংখ্যা
মুসলিম লীগ	১১৪
কংগ্রেস	৮৬
ইউরোপীয়ান	২৫
স্বতন্ত্র হিন্দু	৬
কৃষক প্রজা পার্টি	৪
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৪
কমিউনিস্ট পার্টি	৩
স্বতন্ত্র (মুসলিম)	২
ভারতীয় খ্রিস্টান	২
স্বতন্ত্র তফসিলী	১
হিন্দু মহাসভা	১
ক্ষত্রিয় সমিতি	১
ইমারত পার্টি	১
মোট আসন	২৫০

সূত্র : বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ (১৮৬১-২০০৮), হারুন-অর-রশিদ, হাসিনা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৯।

২.৩ পাকিস্তান আমল : ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধীকার ও স্বতন্ত্র নির্বাচকমন্ডলী এই দুই নীতির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালের ভারত শাসন আইন সংশোধন করে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যা সংখ্যা ২৫০ থেকে ৩০৯ করা হয়। সংশোধন অনুযায়ী ২৩৭টি মুসলমানদের জন্য, ৩১টি সাধারণ আসন, সাধারণ হিন্দুদের জন্য ৩১টি আসন, ২৬টি আসন তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য ১টি আসন, খ্রিস্টানদের জন্য এবং ২টি আসন বৌদ্ধদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া, মুসলমান, সাধারণ হিন্দু এবং তফসিলী হিন্দু সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য ৯, ১ ও ২টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়।

২.৩.১ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন :

মুসলিম লীগের রাজনৈতিক অত্যাচার, জুলুম আর নির্যাতন এবং পূর্ব বাংলার প্রতি ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়গুলো বাংলার রাজনৈতিক সচেতন মানুষকে ফুসিয়ে তুলেছিলো। তারা সত্যিকার অর্থে মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো; আর সেই সুযোগটি আসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধান বিরোধী দলে আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে রাজনৈতিক নির্বাচনী জোট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। আর এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ১৯৫৩ সালে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৩ সালের ৩ ডিসেম্বরে সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ, একে ফজলুল হকে'র নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টি-কেপিপি, মাওলানা আতহার আলীর নিজাম-ই-ইসলাম এবং হাজী মোহাম্মদ দানেশের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক দল মিলে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে রাজনৈতিক জোট গঠন করে। মধ্যপন্থী, গণতন্ত্রী, ইসলামী ও বামপন্থী দল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট কার্যকর জোটে রুপ নেয়।[১৬] ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানি আধিপত্য এই দুইয়ের বিরোধীতাই যুক্তফ্রন্টের মূল ভিত্তি ছিলো। নির্বাচনকে সামনে রেখে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সর্বস্তরের ভোটারদের আকৃষ্ট করতে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা নির্বাচনী কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রচন্ড প্রতাপশালী রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়। এই বিজয় পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক দল, নেতৃবৃন্দ ও মানুষের মনোবল অনেকগুন বাড়িয়ে দেয় এবং সেটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণ হয় পূর্ব বাংলার মানুষ অধিকার সম্পর্কে সচেতন; শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে নামানো যাবেনা। ১৯৩৫ সালের গর্ভমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে প্রবর্তিত অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থাই পাকিস্তান রাষ্ট্র উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। এটি ছিলো প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও আলাদা নির্বাচনমন্ডলি সম্বলিত একটি ব্যবস্থা। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন প্রমাণ করেছিলো পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকরা তাদের স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীকার আন্দোলনের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ প্রায় ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত কারণে মুসলিম লীগ ভোটারদের বিশ্বাস হারায়। নির্বাচনের পর মুসলিম আসনসমূহে দলগত অবস্থান ছিলো নিম্নরুপ :

সারণি : ৪

১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল :

রাজনৈতিক দল	আসন সংখ্যা
আওয়ামী মুসলিম লীগ (যুক্তফ্রন্ট)	১৪৩
কৃষক শ্রমিক পার্টি (যুক্তফ্রন্ট)	৪৮
নেজামে ইসলামী (যুক্তফ্রন্ট)	২২
গণতন্ত্রী দল (যুক্তফ্রন্ট)	১৩
খিলাফত-ই-রবক্ষানি	২
মুসলিম লীগ	৯
পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	২৪
ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি	৫
তফসিলী ফেডারেশন	২৯
গণসমিতি (কংগ্রেস)	১৪
বৌদ্ধ	২
খ্রিস্টান	১
মোট আসন	৩০৯

সূত্র : বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ (১৮৬১-২০০৮), হারুন-অর-রশিদ, হাসিনা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৯।

আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নিজাম-ই-ইসলাম এবং গণতন্ত্রী দল-এই চারদলের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচনী জোট যুক্তফ্রন্ট কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন পেয়ে নির্বাচনে ব্যালট বিপ্লব সাধন করে। এর পেছনে ছিলো শেরে বাংলা ফজলুল হকের ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের আগে ২১ দফা ইশতেহার দেয়। ২১ দফার অন্যতম ছিলো : বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দান ও ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে ভাষা শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা, পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদারি উচ্ছেদ, কৃষকদের মাঝে জমি বিতরণ, পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ, জমিদারি প্রথা বাতিল করা, পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করা, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের চাকুরির ব্যবস্থা প্রভৃতি।[১৭] অন্যদিকে, মুসলিম লীগের বস্তুত কোন নির্বাচনী ইশতেহার ছিলোনা। তবে দলটি থেকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, তারা নির্বাচিত হলে পাকিস্তানের জন্য ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রনয়ণ করবে। দলটি দাবি করে তাদেরকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসানো দরকার এই জন্য যে, অন্যথায় দেশে রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষের অভ্যুদয় ঘটলে ইসলাম ও

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান দু'টিই বিপন্ন হয়ে পড়বে। মুসলিম লীগ নেতারা তাদের নির্বাচনী প্রচারে বিমান, ট্রেন ও স্টিমার ব্যবহার করেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রধান বাংলা 'দৈনিক আজাদ' মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারণা চালায়। এছাড়া, 'মর্নিং নিউজ' নামের ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাটিও নির্বাচনে সক্রিয় সমর্থন দেয় মুসলিম লীগকে।[১৮] মুসলিম লীগ প্রপাগান্ডা চালায় যে, নির্বাচনে তাদের বিরোধীপক্ষ যুক্তফ্রন্টকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে ভারত। নির্বাচনী প্রচারকাজে যুক্তফ্রন্ট বহু সংখ্যক ছাত্রের সমর্থন লাভ করে। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বিরাট ভোটের ব্যবধানে ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজের কাছে বিপুল ভোটের ব্যবধানে হেরে যান। মুসলিম লীগের অনেক প্রার্থী নির্বাচনে জামানত পর্যন্ত হারান। ২২৮টি মুসলিম আসনে ৯৮৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সবগুলো মহিলা আসনেই যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা বিজয়ী হন। তাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনে ৩৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ীর হাসি হাসেন। ঐতিহাসিক ঐ নির্বাচনের আগে, পরে বা নির্বাচনের দিন কোন সহিংসতার কোনো অভিযোগ শোনা যায়নি। বরিশালের বাকেরগঞ্জ জেলায় ভোটার তালিকায় কিছু ত্রুটি ধরা পড়লেও সেটি পরে সংশোধন করা হয়। আর এ কাজে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া হয়। নির্বাচন অপরাধসংক্রান্ত বিষয়ে একটি অর্ডিন্যান্স ও ভোটারদের আঙ্গুলে অমোচনীয় কালির ব্যবহার নির্বাচনকালে বেআইনী কার্যকলাপের প্রতিরোধ করেছিলো। সে সময়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছিলো হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ও অবসরপ্রাপ্ত দু'জন জেলা জজের সমন্বয়ে। কেবল ৫টি নির্বাচনী এলাকায় সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিলো। নির্বাচন চলাকালে ক্ষমতাসীন সরকার ও সরকার সমর্থিত রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ বিরোধীজোটের ওপর নির্যাতন চালায়। মুসলিম নির্বাচনী এলাকাগুলোতে ৩৭.৬০ শতাংশ ভোটার ভোট দেন। যেহেতু নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হয়েছিলো তাই ঐতিহাসিক সেই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অবিস্মরণীয় বিজয় লাভ করে। পরিষদে নির্বাচিত বেশিরভাগ প্রার্থী ছিলেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টির। নির্বাচনের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করলেও সেটি ছিলো স্বল্পস্থায়ী।

২.৩.২ ১৯৫৯ সালে আইউব খানের অধীনে নির্বাচন :

১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর সেনাপ্রধান জেনারেল আইউব খান (পরে যিনি নিজেকে ফিল্ড মার্শাল ঘোষণা করেন) এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নেন। চার বছর পর সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অভিলাসে ১৯৬২ সালে পরোক্ষ ভোটভিত্তিক মৌলিক গণতন্ত্র এবং সে অনুযায়ী একটি সংবিধান প্রনয়ণ করেন। তিনি নতুন শাসনতন্ত্র তৈরীর আগ পর্যন্ত সামরিক শাসনের আওতায় পাকিস্তান শাসন করেন। তার এ শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি ও পরিষদ সদস্যদের পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করে। আইউব খান নির্বাচনে যৌথ নির্বাচকমন্ডলি পদ্ধতিও চালু করেন। জেনারেল খান যুক্তি দেখান যে, তিনি ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত পাকিস্তানে ব্রিটিশ ধাঁচের সংসদীয় ব্যবস্থা চালু ছিলো তবে সেটি পাকিস্তানে জন্য উপযুক্ত নয়। ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর তিনি রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে 'মৌলিক গণতন্ত্র' বা

'জমহুরিয়াত' নামে নতুন এক ব্যবস্থা চালু করেন।[১৯] এ ব্যবস্থা গোড়াতে স্থানীয় সরকার পরিষদের জন্য গৃহীত হয়। পরে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে (যে শাসনতন্ত্র আইউব খান পাকিস্তানে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন) এ ব্যবস্থা দেশের রাষ্ট্রপতি এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমন্ডলি হিসেবে যুক্ত করা হয়। স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনের জন্য যে নির্বাচনী ব্যবস্থা ছিলো সেটিই মৌলিক গণতন্ত্রকামীদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহে ইউনিয়ন বোর্ডসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ ভারত বিভাগের আগে ও পরে যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থায় নির্বাচিত হতো। এটি আইউব শাহীর পতনের দিন পর্যন্ত বলবৎ ছিলো। পরে স্বাধীকার ও স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে জনগণ গণজাগরণ তৈরী করে। ঐ সময় পাকিস্তানে আবারো সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতায় এসে তারা আইউব খানের প্রবর্তিত ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল করে দেয়। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে নতুন ব্যবস্থায় গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদ, ছোট শহরের শহর কমিটি ও নিউনিসিপ্যাল এলাকায় ইউনিয়ন কমিটির মতো ৮১২৬টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৮০ হাজার সদস্য (যাদের মৌলিক গণতন্ত্রী বলা হয়) নির্বাচিত হন। প্রতিটি পরিষদ অথবা কমিটি গড়ে ১০ হাজার লোকের প্রতিনিধিত্ব করেন; যাদের এক হাজার জন যৌথ নির্বাচকমন্ডলি ও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। পরিষদ বা কমিটিগুলো নিজ নিজ চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে। এসব পরিষদ বা কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যরা বিভিন্ন অনুপাতে উচ্চ পর্যায়ের থানা বা তহশিল পরিষদ, জেলা পরিষদ, বিভাগীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে অন্তর্ভূক্ত হন। থানা থেকে প্রাদেশিক পর্যায় পর্যন্ত সব পরিষদেই প্রধান হিসেবে
অ-নির্বাচিত সরকারি কর্মকর্তারা দায়িত্ব পান। এই সব পরিষদ মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার চারস্তর হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক পরিষদ আবারো প্রবর্তনের আগ পর্যন্ত প্রদেশের গভর্নর প্রদেশের শীর্ষ পরিষদের সভাপতিত্ব করতেন। ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ বা শহর কমিটির নির্বাচনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন বা শহরকে কতগুলো ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে ভোট দেয়ার ক্ষমতা বা যোগ্যতাসম্পন্ন সব ব্যক্তির নাম সম্বলিত একটি তালিকা থাকবে। পাকিস্তানে একজন নাগরিক যিনি ২১ বছরের বেশি ও কোনো এলাকায় ৬ মাসের বেশি সময় ধরে বাস করছেন তিনিই এ ব্যবস্থায় ভোট দিতে পারবেন। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত গণভোট আগের নির্বাচিত ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী, আইউব খানের প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে। অর্থাৎ গণভোটে শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ ভোট দেন। এতে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলোনা এবং মৌলিক গণতন্ত্রীরা শুধু 'হ্যাঁ' ভোট অথবা 'না' ভোট দেন।[২০] আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সালে। ১৯৫৯ সালের নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দেন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে মোট সদস্য সংখ্যা ছিলো ১৫৬। দু'টি প্রদেশের

প্রতিটি থেকে ৭৫ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা সদস্য নেয়া হয়। প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিটিতে ছিলো ৫ জন মহিলা সদস্যসহ ১৫৫ জন সদস্য। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ১৫৫ জনের মাত্র ৪ জন নির্বাচিত হন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী থেকে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত ৪০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর মধ্যে ৪৯৬৫ জন ছিলেন হিন্দু।

১৯৬৫ সালের দিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় এবং পাকিস্তানে দুই অংশের ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর প্রায় বেশিরভাগ সদস্যই এ নির্বাচনে ভোট দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ, মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ-ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত বিরোধী দল এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল আইউব খানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র বোন ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দেয়। কিন্তু অনুগত মৌলিক গণতন্ত্রীরা বেশ বড় ব্যবধানে আইউব খানকে নির্বাচিত করে। সম্মিলিত বিরোধী দল তাদের প্রার্থীর পক্ষে জনগণের মাঝে বেশ সাড়া ফেলে; বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে প্রতিয়মান হয় যে, তাদের প্রচারাভিযান ভোটারদের ওপর সামান্যই প্রভাব ফেলেছে।

২.৩.৩ ১৯৭০ সালের নির্বাচন :

পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থানের পর পাকিস্তানে সামরিক শাসনের অধীনের শাসন ব্যবস্থা বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম স্বৈরাচারি শাসন হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিলো উল্লেখযোগ্য রকমের সুষ্ঠু ও অবাধ। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সরল বহুত্ব ও প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনিন ভোটাধিকার ব্যবস্থার অধীনে। সেনাবাহিনী তাদের প্রাক্তন নেতা আইউব খানের অনানুষ্ঠানিক বিদায়ের পর অনেকটা সংযত আচরণ করে; তারা নির্বাচনে কোন হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু ফলাফল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ে তারা স্তম্ভিত হয়ে যায়। পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনীতিবিদদের যোগসাজশে সেনাবাহিনী নির্বাচনী ফলাফল পাল্টে ফেলার চেষ্টা চালায়। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে স্বায়ত্বশাসনের ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এই ৬ দফা দেশবাসির মনে ভীষণভাবে আস্থা সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তানে জনগণ আওয়ামী লীগের ছয়দফা দাবিকে সমর্থন জানায়।[২১] প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ৩০০ আসনে আওয়ামী লীগ পায় ২৮৮টি; আর অন্যান্য দল পায় মাত্র ১২টি আসন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসন বিশিষ্ট পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানে জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের মাধ্যমে প্রমাণ

Dhaka University Institutional Repository

হয় পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্বশাসনের দাবির প্রতি এদেশের মানুষের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। কিন্তু সামরিক জান্তা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠন করতে না দেয়ায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শুরু হয় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন; যেটি পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে রুপ নেয়। ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ভাষণ দেন।[২২] দিক-নির্দেশনামূলক ঐ ভাষণে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য মুক্তিকামি বাঙালিদের প্রস্তুত থাকতে বলেন। ১৮ মিনিটের ঐ ভাষণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দেন। এদিকে, ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনার নাটকের আড়ালে পাকিস্তানি সামরিক শাসক ঢাকায় পাকিস্তানি আর্মি পাঠায়। ২৫ মার্চ কালো রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকার পিলখানা, রাজারবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে নারকীয় আক্রমন, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালায়; হত্যা করে অসংখ্য নিরিহ বাঙালিকে। আর ধানমিন্ডর ৩২ নম্বর রোডের বাড়ি থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে আটকের আগে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ইপিআরের ওয়ারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর অতর্কিতে হায়েনার মতো ঝাপিয়ে পড়েছে সশস্ত্র পাক বাহিনী। তিনি এই হামলা প্রতিরোধে মুক্তিকামি বাঙালিদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। এদিকে, ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। আধুনিক যুদ্ধসাজে সজ্জিত পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে বাশ, লাঠি ও ভাঙ্গা অস্ত্র নিয়ে বাঙালিরা প্রতিরোধের যুদ্ধে এগিয়ে আসে; শুরু হয় রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাসের এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে আনে বাঙলার দামাল ছেলেরা। ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে সৃষ্টি হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের। বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নেয় সবুজের বুকে টকটকে লাল সূর্য খচিত একটি দেশ। তাইতো বলা যায়, ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে এদেশের জনগণের ব্যালট বিজয়ের অভিষ্ট লক্ষ্যের যৌক্তিক পরিণতিতে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ, বাংলাদেশ।

সারণি : ৫

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল :

রাজনৈতিক দল	**প্রার্থী**	**আসন**	**প্রাপ্ত ভোট**	**শতকরা হার**
আওয়ামী লীগ	১৬২	১৬০	১,২৩,৩৮,৯২১	৭৪.৯ %
পিডিপি (নুরুল আমীন)	৭৯	১	৪,৮৩,৫৭১	২.৯ %
নিজাম-ই-ইসলাম	৪৯	০	জানা যায়নি	%
জামায়াতে ইসলাম	৭০	০	৯,৯১,৯০৮	৬ %
পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনভন)	৯৩		৪,৬৪,১৮৫	২.৮ %
পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৫০	০	২,৭৪,৪৫৩	১.৬ %
পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইউম)	৬৫	০	১,৭৫,৮২২	১ %
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাপ (ওয়ালি)	৩৯	০	৩,১০,৯৮৬	১.৮ %
স্বতন্ত্র (রাজা ত্রিদিব রায়)	১১৪	১	৫,৬১,০৮৩	৩.৪ %

সূত্র : বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ (১৮৬১-২০০৮), হারুন-অর-রশিদ, হাসিনা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৯।

সারণি : ৬

১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ (এমপি) নির্বাচনের ফলাফল :

দল	প্রার্থী	আসন	শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	৩০০	২৮৮	৮৯ %
পিডিপি	৭৯	২	১ %
নিজাম-ই-ইসলাম	জানা যায়নি	১	%
জামায়াতে ইসলাম	ঐ	১	৩ %
পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনভন)	ঐ	০	১ %
পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	ঐ	০	০.০৫ %
পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইউম)	ঐ	০	০.০৫ %
ন্যাপ (ওয়ালি)	ঐ	১	০.৯ %
স্বতন্ত্র	জানা যায়নি	৭	৫ %

সূত্র : বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ (১৮৬১-২০০৮), হারুন-অর-রশিদ, হাসিনা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৯।

২.৪ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন :

পাকিস্তানের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিদ্ধস্ত একটি দেশকে গোছাতে দরকার ছিলো একটি স্বাধীন ও নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারব্যবস্থা। এ উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচনের আয়োজন করে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারি দল আওয়ামী লীগের বিরোধীতাকারিরা সে সময় চেয়েছিলো স্বাধীন বাংলাদেশ পরিচালিত হবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা। এ জন্য ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচনার পর জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের সত্যিকার অর্থে জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের যুদ্ধে নামতে হয় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে। দেশের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন বিচারপতি এম ইদ্রিস। তিনি ১৯৭২ সালের ৭ জুলাই থেকে ১৯৭৭ সালের ৭ জুলাই পর্যন্ত ৫ বছর সিইসি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। নির্বাচনে ১৪টি রাজনৈতিক দলের ১ হাজার ৯১ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। বাতিল হয়ে যায় ৪ জনের আবেদনপত্র; মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন ১০৮ জন প্রার্থী। মোট ৩ কোটি ৫২ লাখ ৫ হাজার ৬৪২ জন ভোটারের মধ্যে ১ কোটি ৯৩ লাখ ২৯ হাজার ৬৮৩ জন ভোটার স্বাধীন দেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেন, যা মোট ভোটের ৫৪.৯১ শতাংশ। বৈধ ভোট পড়ে ১ কোটি ৮৮ লাখ ৫১ হাজার ৮০৮টি। ভোট বাতিল হয় ৪ লাখ ৭৭ হাজার ৮৭৫টি। ভোট কেন্দ্র ছিলো ১৫ হাজার ৮৪টি আর কক্ষ ৫৯ হাজার ১১৩টি। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ৩০০ আসনে মধ্যে ২৯৩টিতে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ৭ মার্চে ২৯৯ আসনে নির্বাচন হয়; একটি আসনের প্রার্থী মারা যাওয়ায় ঐ আসনে নির্বাচন স্থগিত থাকে। পরে ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিজয়ী হন। তুমুল জনপ্রিয় অবস্থায় থাকা আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা ১১টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচিত হন ৩টি আসনে; বরিশালের বাকেরগঞ্জ-৪, ঢাকা-৬ (বর্তমান ঢাকা-৬ আসন যেটি) এবং ঢাকা-১৫ আসন থেকে। অন্যদিকে, আ স ম আব্দুর রবের নেতৃত্বাধীন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ১টি আসন পায়।[২৩] ঢাকা-১৯ থেকে আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগ পায় ১টি আসন।[২৪]

এছাড়া, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হন ৫টি আসনে। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হন মোহাম্মদ উল্লাহ; পরে স্পিকারের দায়িত্ব পান আব্দুল মালেক উকিল। বঙ্গবন্ধু নির্বাচিত হন সংসদ নেতা হিসেবে। পরে সংসদ নেতার দায়িত্ব দেয়া হয় ক্যাপ্টেন (অব.) এম মনসুর আলীকে।

সারণি : ৭

১৯৭৩ সালের অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল :

দল	প্রার্থী	আসন	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার	প্রতীক
আওয়ামী লীগ	৩০০	২৯৩	১,৩৭,৯৩,৭১৭	৭৩.২ %	নৌকা
জাসদ (রব)	২৩৭	১	১২,২৯,১১০	৬.৫২%	মশাল
ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	২২৪	০	১৫,৬৯,২৯৯	৮.৩৩%	কুঁড়ে ঘর
ন্যাপ (ভাসানী)	১৬৯	০	১০,০২,৭৭১	৫.৩২%	ধানের শীষ
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৪	০	৪৭,২১১	০.২৫%	তালা
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিন)	২	০	১৮,৬১৯	০.১০%	গরুর গাড়ি
বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি	৩	০	১১,৯১১	০.০৬%	কুড়াল
জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান)	৮	১	৬২,৩৫৪	০.৩৩%	লাঙ্গল
বাংলা জাতীয় লীগ	১১	০	৫৩,০৯৮	০.২৮%	গাভী
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদি দল	৩	০	৩৮,৪২১	০.২০%	ছাতা
বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস	৩	০	৩৭৬১	০.০২%	কলস
জাতীয় গণতান্ত্রিক দল	১	০	১৮১৪	০.০১%	চাকা
বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন	৩	০	১৭,২৭১	০.০৯%	ঘোড়া
ছাত্র ইউনিয়ন	১	০	৭৫৬৪	০.০৪%	দোয়াত-কলম
স্বতন্ত্র	১২০	৫	৯,৮৯,৮৮৪	৫.২৫%	বিভিন্ন প্রতীক
মোট		৩০০			

সূত্র : Report on the First General Election to Parliament in Bangladesh, Bangladesh Election Comission, 22 June 1973, Dacca.

২.৫ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন :

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মোট ২৯টি দল অংশ নেয়। ভোটার ছিলো ৩ কোটি ৮৩ লাখ ৬৩ হাজার ৮৫৮ জন। এ সময়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন বিচারপতি নূরুল ইসলাম। নির্বাচনে প্রার্থীদের জামানত ছিলো ২ হাজার টাকা। নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ছিলো ১৬ জানুয়ারি, বাছাই ১৭ জানুয়ারি আর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ ছিলো ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনে মোট ব্যয় হয় ৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা। মনোনয়নপত্র জমা দেন ২ হাজার ৩৫২ জন প্রার্থী। এদের মধ্যে ৮ জনের আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যায় আর আবেদনপত্র ফেরত নেন ২১৯ জন প্রার্থী। ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন হয় ৩১ মার্চ ১৯৭৯ সালে। নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল, বিএনপি ২৯৮টি আসনে প্রার্থী দিয়ে জয় পায় ২০৭টি আসনে। ভোটের হার ৪১.১৬ শতাংশ। এদিকে, নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে দু'ভাগ হয়ে যায় আওয়ামী লীগ। দলের এক অংশের নেতৃত্ব দেন মালেক উকিল ও অন্য অংশের নেতৃত্বে ছিলেন মিজানুর রহমান চৌধুরী। মালেক উকিলের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ২৯৫টি আসনে প্রার্থী দিলেও বিজয়ী হয় মাত্র ৩৯টি আসনে। ভোটের হার ২৪.৫৫ শতাংশ। আর মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৮৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পায় মাত্র ২টি আসন। অন্যদিকে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ (রব) পায় ৮টি আসন, মুসলিম লীগ ও ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ যৌথভাবে পায় ২০টি আসন, ন্যাপ (মোজাফফর) ১টি, গণফ্রন্ট ২টি (কৃষক শ্রমিক পার্টি, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (সিদ্দিক), জাতীয় দল, ন্যাপ (সবুর), পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি ও সাম্যবাদী দল) পায় ২টি আসন। অন্যদিকে, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ২টি, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ১টি, জাতীয় একতা পার্টি ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১৬টি আসনে বিজয়ী হন। সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ২ এপ্রিল ১৯৭৯ সালে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন বাংলাদেশের চরম বিরোধীতাকারি ও পাকিস্তানের পরম মিত্র শাহ আজিজুর রহমান।[২৫] অন্যদিকে, বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হন আসাদুজ্জামান খান। জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হন মির্জা গোলাম হাফিজ।

সারণি : ৮

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল :

রাজনৈতিক দল	প্রার্থী	আসন	শতকরা হার	প্রতীক
বিএনপি	২৯৮	২০৭	৪১.১৬ %	ধানের শীষ
আওয়ামী লীগ (মালেক উকিল)	২৯৫	৩৯	২৪.৫৫ %	নৌকা
আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৪	২	২.৭২ %	মই
মুসলিম লীগ ও ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (জোটবদ্ধভাবে)	২৬৬	২০	১০.০৮%	হারিকেন
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (রব)	২৪০	৮	৪.৮৪%	মশাল
ন্যাপ (মোজাফফর)	৮৯	১	২.২৫%	কুঁড়ে ঘর
গণফ্রন্ট (কৃষক শ্রমিক পার্টি, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (সিদ্দিকী), জাতীয় দল, ন্যাপ (সাত্তার) ও পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির সমন্বয়ে জোট)	৪৬	২	০.৬০%	বাই সাইকেল
সাম্যবাদী দল	২০	১	০.৩৯%	বাস
জাতীয় লীগ	১৪	২	০.৩৬%	লাঙ্গল
গণতান্ত্রিক আন্দোলন	১৮	১	০.১৭%	ঘড়ি
জাতীয় একতা পার্টি	৫	১	০.২৩%	দোয়াত-কলম
স্বতন্ত্র		১৬		বিভিন্ন প্রতীক
মোট		৩০০		

সূত্র : Report on Parliamentary Election, 1979, Bangladesh Election Comission, 1982, Dacca.

২.৬ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন :

১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৮টি দল অংশ নেয়। মোট আবেদনকারি প্রার্থী ছিলো ১ হাজার ৫২৭ জন। নির্বাচনে মোট ব্যয় হয় ৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা। মোট ভোটার ছিলো ৪ কোটি ৭৮ লাখ ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ কোটি ৪৯ লাখ ৩৫ হাজার ৯৯৩ জন; আর মহিলা ভোটার ২ কোটি ২৩ লাখ ৮৯ হাজার ৮৯৩ জন। সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন হয় ৭ জুলাই; এর সদস্য সংখ্যা ছিলো ৩০ জন। মোট ভোট দেয় ২ কোটি ৮৫ লাখ ২৬ হাজার ৬৫০

জন ভোটার (মোট ৬০.৩১ শতাংশ)। সারাদেশে ভোটকক্ষ ছিলো ২৩ হাজার ২৭৯টি। আর ভোট কেন্দ্র ২৩ হাজার ২৭৯টি। নির্বাচনে জাতীয় পাটি ৩০০টি আসনে প্রার্থী দিলেও বিজয়ী হয় ১৮৩টি আসনে। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ ২৫৬টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৭৬টিতে বিজয়ী হয়। জামায়াতে ইসলামী ৭৬টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১০টিতে বিজয়ী হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ৫টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর) ২টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) ৫টি, বাকশাল ৩টি, জাসদ (রব) ৪টি আসন, জাসদ (শাহজাহান সিরাজ) ৩টি আসন, মুসলিম লীগ ৪টি আসন, ওয়ার্কার্স পার্টি ৩টি আসন, আর স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৩২টি আসনে বিজয়ী হয়। সংসদের নেতা নির্বাচিত হন মিজানুর রহমান চৌধুরী।[২৬] অন্যদিকে, বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। আর স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন যথাক্রমে শামসুল হুদা চৌধুরী ও কোরবান আলী। এই সংসদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর।

সারণি : ৯

১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল :

দল	প্রার্থী	আসন	শতকরা হার	প্রতীক
জাতীয় পার্টি	৩০০	১৫৩	৪২.৩৪%	লাঙ্গল
আওয়ামী লীগ	২৫৮	৭৬	২৬.১৬%	নৌকা
জামায়াত	৭৭	১০	৪.৬০%	দাড়ি পাল্লা
ওয়ার্কার্স পার্টি (নজরুল)	তথ্য পাওয়া যায়নি	৩	০.৫৩%	হাতুড়ি
ন্যাপ (ভাসানী)	২০	৫	১.২৯%	তার কা
ন্যাপ (মোজাফফর)		২	১.২৯%	কুঁড়েঘর
সিপিবি	৯	৫	০.৯১%	চাবি
বাকশাল	৬	৩	০.৬৭%	কাস্তে
জাসদ (রব)	১৩৭	৪	২.৫৪%	মশাল
জাসদ (সিরাজ)	১৪	৩	০.৮৭%	মাছ
মুসলিম লীগ	১০২	৪	১.৪৫%	হারিকেন
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	৪৪৮	৩২	১৬.১৯%	বিভিন্ন প্রতীক
মোট		৩০০		

সূত্র : জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৮৬, নির্বাচন কমিশন।

২.৭ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন :

১৯৮৮ সালের ৩ মার্চে অনুষ্ঠিত হয় সংসদের চতুর্থ নির্বাচন। এতে মোট ৯টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন বিচারপতি এ টি এম মাসউদ। ১১২০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন তবে কমিশনের বাছাইয়ে বাতিল হয় ২৬ জনের। আর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন ১১৬ জন প্রার্থী। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন জাতীয় পার্টির ১৮ জন প্রার্থী। মোট ভোটার ছিলো ৪ কোটি ৯৮ লাখ ৬৩ হাজার ৮২৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২ কোটি ৬৩ লাখ ৮৯ হাজার ৯৪৪ জন; আর মহিলা ভোটার ছিলেন ২ কোটি ৩৪ লাখ ৮৩ হাজার ৮৮৫ জন। ভোট দেয় ২ কোটি ৮৮ লাখ ৭৩ হাজার ৫৪০ জন ভোটার যা মোট ভোটের ৫৪.৯৩ শতাংশ। ২২৩৯৩টি ভোটকেন্দ্র আর ভোটকক্ষ ছিলো ৮৬৯৪৮টি। নির্বাচনে ২৯৯টি আসনে প্রার্থী দিয়ে এইচ এম এরশাদের দল জাতীয় পার্টি পায় ২৫১টি আসন। অন্যদিকে, সম্মিলিত বিরোধীদল ২৬৯টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১৯টিতে বিজয়ী হয়। জাসদ (শাহজাহান সিরাজ) ২৫টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পায় ৩টি আসন। বঙ্গবন্ধুর খুনী কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) ফারুক রহমানের নেতৃত্বাধীন ফ্রিডম পার্টি ১১২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পায় ২টি আসন।[২৭] ২১৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিলেও বিজয়ী হন ২৫ জন। প্রথমে চতুর্থ সংসদের নেতা নির্বাচিত হন মিজানুর রহমান চৌধুরী; পরে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এবং সবশেষ কাজী জাফর আহমেদ। তিনজনই পর্যায়ক্রমে এরশাদের মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। চতুর্থ সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হন জাসদ সভাপতি আ স ম আব্দুর রব। এছাড়া, সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন শামসুল হুদা চৌধুরী এবং রিয়াজউদ্দিন আহমেদ।

সারণি : ১০

১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল :

দল	প্রার্থী	আসন	শতকরা হার	প্রতীক
জাতীয় পার্টি	২৯৯	২৫১	৬৮.৪৪%	লাঙ্গল
সম্মিলিত বিরোধীদল (আসম রবের নেতৃত্বাধীন)	২৬৯	১৯	১২.৬৩%	মশাল
ফ্রিডম পার্টি	১১২	২	০.৯৪%	কুড়াল
জাসদ (সিরাজ)	২৫	৩	১.২০%	জানা যায়নি
স্বতন্ত্র	২১৪	২৫	১৩.৫০%	বিভিন্ন প্রতীক
মোট		৩০০		

সূত্র : জাতীয় সংসদ নির্বাচন হ্যান্ডবুক, আরএফইডি, ২০০৬

২.৮ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন :

দেশে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। মোট ৩৮৫৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেন; এর মধ্যে বাতিল হয় ৫৬টি। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে ৭৫টি রাজনৈতিক দল। মনোনয়নপত্র দাখিল ছিলো ১৩ জানুয়ারি, বাছাই ১৪ জানুয়ারি ও প্রত্যাহার ছিলো ১৯৯১ সালের ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মোট ব্যয় হয় ২৫ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ। প্রার্থী জামানত ছিলো ৫০০০ টাকা। মোট ভোটার ছিলো ৬ কোটি ২০ লাখ ৮১ হাজার ৭৯৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩ কোটি ৩০ লাখ ৪০ হাজার ৭৫৭ জন আর নারী ভোটার ২ কোটি ৯০ লাখ ৪১ হাজার ৩৬ জন। নির্বাচনে ভোট দেয় ৩ কোটি ৪৪ লাখ ৭৭ হাজার ৮০৩ জন যা মোট ভোটের ৫৫.৪৫ শতাংশ। তবে বৈধ ভোট পড়ে ৩ কোটি ৪১ লাখ ৩ হাজার ৭৭৭টি; যা মোট ভোটের ৫৪.৯৩ শতাংশ। নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র ছিলো ২৪ হাজার ১৫৪টি আর ভোটকক্ষ ১ লাখ ১২ হাজার ২৭৭টি। সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিলো ৩০টি। নির্বাচনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে ১৪০টিতে বিজয়ী হয়। আর আওয়ামী লীগ ২৬৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে লাভ করে ৮৮টি আসন। অন্যদিকে, জাতীয় পার্টি ২৭২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৩৫টি আসন পায়। জামায়াতে ইসলামী ২২২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পায় ১৮টি আসন। এছাড়া, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) ৬৮টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পায় ৫টি আসন। জাকের পার্টি ২৫১টি আসনে প্রার্থী দিয়ে একটি আসনও পায়নি। জাসদ (শাহজাহান সিরাজ) ১টি, ইসলামী ঐক্যজোট ১টি, সিপিবি ৫টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ১টি, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এনডিপি ১টি, গণতন্ত্রী পার্টি ১টি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ১টি ও অন্যান্য দল ৩টি আসন পায়। এই নির্বাচনে ৪২৯ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও একজনও বিজয়ী হতে পারেন নাই। এই সংসদে বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া সংসদ নেতা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হন। আর বরিশাল-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুর রহমান বিশ্বাস স্পিকার ও খুলনার-৪ আসনের সংসদ সদস্য শেখ রাজ্জাক আলী ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

সারণি : ১১

১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল :

রাজনৈতিক দল	প্রার্থী	আসন	শতকরা হার	প্রতীক
বিএনপি	৩০০	১৪০	৩০.৮১%	ধানের শীষ
আওয়ামী লীগ	২৬৪	৮৮	৩০.০৮%	নৌকা
জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	২৭২	৩৫	১১.৯২%	লাঙ্গল
জামায়াতে ইসলামী	২২২	১৮	১২.১৩%	দাড়ি পাল্লা
বাকশাল	৬৪	৫	১.৪১ %	কাস্তে
সিপিবি	৪৯	৫	১.১৯%	তারা
গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	১	০.৪৫%	কবুতর
জাসদ (সিরাজ)	৩১	১	০.২৫%	হাতপাখা
ন্যাপ (মোজাফফর)	৩১	১	০.৭৬%	কুড়েঘর
ইসলামি ঐক্যজোট	৫৯	১	০.৭৯%	মিনার
ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	১	০.১৯%	হাতুড়ি
এনডিপি	২০	১	০.৩৬ %	বাঘ
অন্যান্য	৪২৯	৩	৪.৭৮%	বিভিন্ন প্রতীক
স্বতন্ত্র	৪২৪	০	৪.৩৯%	বিভিন্ন প্রতীক
মোট	২৭৮৭	৩০০		

সূত্র : জাতীয় সংসদ নির্বাচন হ্যান্ডবুক, আরএফইডি, ২০০৬

২.৯ ষষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচন :

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে দেশ-বিদেশে নানা বিতর্কি হয়েছিলো। এতে বিএনপি'র ৪৯ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্ধিতায় নির্বাচিত হন। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুধু বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেয়, সঙ্গে যোগ হয় নাম সর্বস্ব ৪১টি দল। অর্থাৎ ৪২টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিলেও দেশের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী নির্বাচন বর্জন করে। এই ৩টি দল শুধু বর্জনই করেনি, নির্বাচন প্রতিহতের চেষ্টা চালায়। ফলে দেশে-বিদেশে ঐ নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ১৯৮৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিলে বাতিল হয় ১০৮ জনের। শেষ মূহুর্তে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন ১৪১ জন প্রার্থী। মোট ভোটার ছিলো ৫ কোটি ৬১ লাখ

৪৯ হাজার ১৮২ জন। ভোট দেয় ১ কেটি ১৭ লাখ ৭৬ হাজার ৪৮১ জন (২৬.৭৪ শতাংশ)। বিএনপি ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে ২৭৯টি আসনে বিজয়ী হয়। ফ্রিডম পার্টি ১টি আসন আর স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১০টি আসন পায়। সংসদের অধিবেশন শুরু হয় ১৯ মার্চ আর শেষ হয় ২৫ মার্চ। মোট কার্যদিবস ছিলো ৭ দিন। সংসদ নেতা নির্বাচিত হন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। আর বিরোধীদলীয় নেতা হন ফ্রিডম পার্টির সভাপতি ও বঙ্গবন্ধুর খুনী (যাকে ২০১০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়) কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) ফারুক। স্পিকার নির্বাচিত হন শেখ রাজ্জাক আলী, তার ডেপুটি নির্বাচিত হন এল কে সিদ্দিকী। নির্বাচনে ভোটের হার : ২৬.৫৪%। মোট ২৯০টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১০টি আসনে নির্বাচন স্থগিত হয়। এ আসনগুলো হলো : রংপুর-১,২,৩,৪,৫,৬, সিরাজগঞ্জ-১, গোপালগঞ্জ-২, শরিয়তপুর-১ এবং গাইবান্ধা-১ আসন। আর শরিয়তপুর-১ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ ছিলো। ভোটার : ৫,৬১,৪৯,১৮২; প্রদত্ত ভোট : ১,১৭,৭৬,৪৮১। পোলিং সেন্টার : ২১,১০৬টি। ৬ষ্ট সংসদে মহিলা আসন ছিলো : ৩০টি।

সারণি : ১২

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ষষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	প্রার্থী	আসন	শতকরা হার	প্রতীক
বিএনপি	৩০০	২৭৯	৭৭.৬২%	ধানের শীষ
ফ্রিডম পার্টি	পাওয়া যায়নি	১	পাওয়া যায়নি	কুড়াল
স্বতন্ত্র	৪৫৭	১০	১২.৪৪%	বিভিন্ন প্রতীক
মোট	১৪৫০	২৯০		

সূত্র : নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, বাংলাদেশ গেজেট ১৯৯৬।

২.১০ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন:

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন আবু হেনার অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে মোট ৩০৯৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন; বাতিল হয় ১১৩ জনের আর প্রত্যাহার করে নেন ৪০৮ জন প্রার্থী। নির্বাচনে রাজনৈতিক দল অংশ নেয় ৮১টি। মোট ভোটার ছিলো ৫ কোটি ৬৭ লাখ ২ হাজার ৪২২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২ কোটি ৮৭ লাখ ৫৯ হাজার ৯৯৮ জন; আর মহিলা ভোটার ২ কোটি ৭৯ লাখ ৫৬ হাজার ৯৪১ জন। ভোট দেয় 4 কোটি ২৮ লাখ ৮০ হাজার ৬৫৪ জন; যা মোট ভোটের ৭৫.৬০ শতাংশ। এর মধ্যে বৈধ ভোট পড়ে ৪ কোটি ২৪ লাখ ১৮ হাজার ২৭৪টি, যা মোট ভোটের ৭৪.৮১

শতাংশ। ভোট কেন্দ্র ছিলো ২৫ হাজার ৯৫২টি। ভোটকক্ষ ছিলো ১ লাখ ১৪ হাজার ৭৪৯ টি। আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে ১৪৬টি আসন পায় অন্যদিকে, বিএনপি ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে পায় ১১৬টি আসন। জাতীয় পার্টি ২৯৩টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৩২টিতে জয় লাভ করলেও জামায়াত ৩০০ আসনে পায় মাত্র ৩টি আসন। ইসলামী ঐক্যজোট ১টি, জাসদ (রব) ১টি আর স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১টি আসনে বিজয়ী হন। নির্বাচনে মোট খরচ হয় ৭১ কোটি টাকা। প্রার্থী জামানত ৫০০০ টাকা। নির্বাচনে ২৯টি দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। সংসদ নেতা নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। আর বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। অন্যদিকে, স্পিকার নির্বাচিত হন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। তার মৃত্যুর পর ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ স্পিকারের দায়িত্ব পান।

সারণি : ১৩

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত সপ্তম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল :

রাজনৈতিক দল	প্রার্থী	আসন	ভোটের হার	প্রতীক
আওয়ামী লীগ	৩০০	১৪৬	৩৭.৪৪%	নৌকা
বিএনপি	৩০০	১১৬	৩৩.৬০%	ধানের শীষ
জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	২৯৩	৩২	১৬.৪০%	লাঙ্গল
জামায়াতে ইসলামী	৩০০	৩	৮.৬১%	দাড়ি পাল্লা
জাসদ (রব)	৭৬	১	০.২৩%	মশাল
ইসলামি ঐক্যজোট	১৬৬	১	১.০৯%	মিনার
স্বতন্ত্র	২৮৪	১	১.০৬%	বিভিন্ন প্রতীক
মোট		৩০০		

সূত্র : জাতীয় সংসদ নির্বাচন হ্যান্ডবুক, আরএফইডি, ২০০৬

২.১১ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন :

২০০১ সালে পহেলা অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। মনোনয়নপত্র দাখিল হয় ২৯ আগষ্ট। বাছাই হয় ৩০ ও ৩১ আগস্ট। আর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা হয় ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে। নির্বাচনে ব্যয় হয় ৯৫ কোটি টাকা। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ কমিশনের অধীনে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে প্রার্থীর ফেরতযোগ্য জামানত ধরা হয়েছিলো ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা। মোট ৫৫টি দল নির্বাচনে অংশ নেয়। মোট আবেদনকারী প্রার্থী ছিলেন ২ হাজার ৫৬৩ জন। বাতিল ১১২ জনের। ফেরত ৫১২ জনের। মোট ভোটার ৭ কেটি ৪৯ লাখ ৪৬ হাজার ৩৬৮ জন। এ মধ্যে পুরুষ ৩ কোটি ৮৫ লাখ ৩০ হাজার ৪১৪ জন। অন্যদিকে, মহিলা ভোটার ৩ কোটি ৬২ লাখ ৯৩ হাজার ৪৪১ জন। নির্বাচনে ভোট দেয় ৫ কোটি ৬১ লাখ ৮৫ হাজার ৭০৭ (৭৫.৫৯ শতাংশ) জন ভোটার। এর মধ্যে বৈধ ভোটার ছিলো ৫ কোটি ৫৭ লাখ ৩৬ হাজার ৬২৫ (৭৪.৩৭ শতাংশ)। সারাদেশে মোট ভোট কেন্দ্র ছিলো ২৯ হাজার ৯৭৮টি। আর ভোটকক্ষ ব্যবহৃত হয় ১ লাখ ৪১ হাজার ২৮২টি। অষ্টম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করলে দলের সিনিয়র নেতা অধ্যাপক ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যুতে তার দলের সম্পর্ক চরম খারাপ হলে সংসদের তৃতীয় অধিবেশন চলাকালে হঠাৎ করে বিএনপি'র সংসদীয় দল ১৯ ও ২০ জুন (২০০২ সাল) সভা করে সর্বসম্মতিক্রমে তার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে এবং রাষ্ট্রপতির পদ থেকে তার পদত্যাগ দাবি করে। অধ্যাপক বি চৌধুরী তার দলের সিদ্ধান্ত চাপের মুখে মেনে নিয়ে ২০০২ সালের ২১ জুন রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরে সংবিধান অনুযায়ী স্পিকার ও বিএনপি'র সিনিয়র নেতা ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকারকে বিএনপি সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ২০০২ সালের ২২ জুন থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে ছিলেন। পরে ৬ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিলে পঞ্চগড়-২ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার আবারো স্পিকারের দায়িত্ব ফিরে পান।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে পায় মাত্র ৬২টি আসন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল, বিএনপি ২৫২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পায় ১৯৩টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। জামায়াতে ইসলামী ৩১টি আসনে প্রার্থী দিলে পায় ১৭টি আসন। আর সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি ও বরিশালের চরমোনাইয়ের পীর মাওলানা ফজলুল করিমের নেতৃত্বাধীন দল ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট সমন্বিতভাবে ২৮১টি আসনে প্রার্থী দেয়। তবে তারা নির্বাচনে মাত্র ১৪টি আসন পায়, যার বেশিরভাগই এরশাদের দূর্গ বলে পরিচিত দেশের উত্তরাঞ্চলে। এদিকে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ও এরশাদের আমলে মন্ত্রী নাজিউর রহমান মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় পাটি-বিজেপি নির্বাচনে ৪ টি আসন লাভ করে। আর

এইচ এম এরশাদের আরেক রাজনৈতিক সহকর্মী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পাটি নির্বাচনে ১টি আসনে বিজয়ী হয়। এছাড়া, ইসলামী ঐক্যজোট ২টি, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তমের গড়া রাজনৈতিক দল কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ১টি আসন পায়। আর সারাদেশে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৬টি আসনে নির্বাচিত হন। অষ্টম সংসদের নেতা নির্বাচিত হন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। অন্যদিকে, বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। স্পিকার জমিরউদ্দিন সরকার আর ডেপুটি স্পিকার আখতার হামিদ সিদ্দিকীকে নির্বাচিত করেন সংসদ সদস্যরা।

সারণি : ১৪

২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল :

রাজনৈতিক দল	প্রার্থী	আসন	ভোটের হার	প্রতীক
বিএনপি	২৫২	১৯৩	৪০.৮৬%	ধানের শীষ
আওয়ামী লীগ	৩০০	৬২	৪০.২১%	নৌকা
জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	২৮১	১৪	৭.২৬%	লাঙ্গল
জামায়াতে ইসলামী	৩১	১৭	৪.২৯%	দাড়িপাল্লা
বিজেপি	১১	৪	১.১২%	গরুর গাড়ি
জেপি (মঞ্জু)	১৪০	১	০.৪৪%	বাইসাইকেল
ইসলামী ঐক্যজোট	৭	২	০.৬৮%	মিনার
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৩৯	১	০.৪৭%	গামছা
স্বতন্ত্র	৪৮৬	৬	৪.০৬%	বিভিন্ন প্রতীক
মোট	১৯৩৯	৩০০		

সূত্র : জাতীয় সংসদ নির্বাচন হ্যান্ডবুক, আরএফইডি, ২০০৬

২.১২ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন :

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা পায়। নির্বাচনে ৮৭.১৩ শতাংশ মানুষ ভোট দেয়। ঐ সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন ড. এটিএম শামসুল হুদা। নির্বাচনে ৩৮টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ মোতাবেক বিজেপি চারদলীয় জোটের নেতৃত্বে থাকা দল বিএনপি'র প্রতীক ধানের শীষ নিয়ে

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তবে, কিছু কিছু আসনে চারদলীয় জোটের শরিক বিভিন্ন দলের একাধিক প্রার্থী থাকায় প্রত্যেকেই তাদের মূল দলের প্রতীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অন্যদিকে, মহাজোটের অন্যতম শরিক দল ওয়ার্কাস পার্টি ও জাসদ (ইনু) জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী শরিক (ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদ) দলগুলো মহাজোটের নেতৃত্বাধীন দল আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করে। তবে কিছু কিছু আসনে মহাজোটের শরিক বিভিন্ন দলের একাধিক প্রার্থী থাকায়, প্রত্যেক প্রার্থীই তাদের মূল দলের প্রতীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

এই নির্বাচনে 'না' ভোট-এর প্রচলন হয়। রাঙামাটিতে সবচে বেশি ৩২ হাজার ৬৭টি 'না' ভোট পড়ে ; যা ঐ আসনের মোট ভোটের ৯.৬৬ শতাংশ। পরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট ক্ষমতায় এসে নির্বাচনী আইন সংশোধন করে 'না' ভোটের বিধান বাতিল করে। নবম সংসদ নির্বাচনের আগে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে জাতীয় পরিচয়পত্রসহ ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা করা হয়। নির্বাচনে জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করা হয়নি। এটি কেন্দ্রীয় সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়েছিলো; যার আলোকে দেশের নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হয়। নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলো ৮ কোটি ১০ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩ জন (২৯৯টি আসনে)। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩ কোটি ৯৮ লাখ ২২ হাজার ৫৪৯ জন; মহিলা ভোটার ৪ কোটি ১২ লাখ ৩৬ হাজার ১৪৯ জন। ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের আগে নোয়াখালী-১ আসনে গণতন্ত্রী পার্টির প্রার্থী ও দলটির সভাপতি নূরুল ইসলাম মারা গেলে ঐ আসনের নির্বাচন স্থগিত করা হয়। পরে ২০০৯ সালের ১২ জানুয়ারি নোয়াখালী-১ আসনে (নির্বাচনী এলাকা-২৬৮) ভোট হয়। সব মিলিয়ে নবম সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনে মোট ভোটার ছিলো ৮ কোটি ১০ লাখ ৯৩ হাজার ৯শ' ৩৩ জন। ২৯ ডিসেম্বরে ২৯৯টি আসনের জন্য ভোট কেন্দ্র ছিলো ৩৫ হাজার ২৬৩টি; এর মধ্যে ভোটকক্ষ ১ লাখ ৭৭ হাজার ২৭৭টি। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ছিলেন ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৪ জন। প্রিসাইডিং অফিসার ৩৫ হাজার ২৬৩ জন কর্মকর্তা, যাদের সহযোগিতার জন্য ছিলেন ১ লাখ ৭৭ হাজার ২৭৭ জন সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার। পোলিং অফিসার ৩ লাখ ৫৪ হাজার ৫৫৪ জন। ৬৪ জেলায় রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বে ছিলেন ৬৪ জন কর্মকর্তা। আর সহকারি রিটার্নিং অফিসার ছিলেন ৪৭৫ জন। নির্বাচনে সার্বিক আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় র‍্যাব, আনসার, আমর্ড পুলিশ, বিডিআর, কোস্ট গার্ড, গ্রাম পুলিশ মিলে ৫ লাখের বেশি ফোর্স মোতায়েন ছিলো। ৩০০ আসনে মোট প্রার্থী ছিলো ১৫৫৫ জন। সাধারণ কেন্দ্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয় ১৪ জন করে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে ১৮ জন; দ্বীপ অঞ্চল, তিন পার্বত্য জেলা ও হাওড় এলাকায় সাধারণ ভোট কেন্দ্র ১৫ জন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্র ১৬ জন মোতায়েন ছিলো।

সারণি : ১৫

Dhaka University Institutional Repository

নবম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারি রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা :

ক্রমিক নং	দল	প্রতীক	প্রার্থীর সংখ্যা
১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	২৬৩
২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	ধানের শীষ	২৫৯
৩	জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	লাঙ্গল	৪৮
৪	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	দাঁড়িপাল্লা	৩৯
৫	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ (ইনু)	মশাল (২), নৌকা (৪)	৬
৬	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন)	হাতুড়ি (২), নৌকা (৩)	৫
৭	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	ছাতা	১৮
৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, বিজেপি	ধানের শীষ	২
৯	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	হাতপাখা	১৬৬
১০	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	খেজুর গাছ(৫) ধানের শীষ (২)	৭
১১	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	কুলা	৬৩
১২	জাকের পার্টি	গোলাপ ফুল	৩৭
১৩	ইসলামী ঐক্যজোট (মুফতি আমিনী)	মিনার (২), ধানের শীষ(২)	৪
১৪	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি, জাগপা	হুক্কা (১) ধানের শীষ (১)	২
১৫	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা	৪৬
১৬	গণফোরাম	উদীয়মান সূর্য	৪৫
১৭	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, সিপিবি	কাস্তে	৩৭
১৮	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল, বাসদ (খালেকুজ্জামান)	মই	৫৭
১৯	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জেএসডি (রব)	তারা	৪৪
২০	বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্ট্র	মোমবাতি	১৮
২১	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	রিক্সা	৮
২২	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	কুঁড়েঘর	১৪
২৩	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	হাতঘড়ি	৩৯
২৪	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	ফুলের মালা	৩১

২৫	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	বটগাছ (৩১), হাতপাখা (১)	৩২
২৬	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল, পিডিপি	বাঘ (১) কুলা (২০)	২১
২৭	ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	আম	২৯
২৮	জাতীয় পর্টি, জেপি (মঞ্জু)	বাইসাইকেল	৭
২৯	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পাটি, বাংলাদেশ ন্যাপ	গাভী	৫
৩০	গণফ্রন্ট	মাছ	১৪
৩১	ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন	চাবি	১১
৩২	গণতন্ত্রী পার্টি	কবুতর	৫
৩৩	বাংলাদেশের বিপণ্ডবী ওয়ার্কার্স পার্টি	কোদাল	৫
৩৪	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	হারিকেন	৫
৩৫	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	চেয়ার	২
৩৬	বাংলাদেশের সাম্যবাদি দল (এম.এল)	চাকা	১
৩৭	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (ডা. মতিন)	কাঠাল	১০
৩৮	ফ্রিডম পার্টি	কুড়াল	২

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সারণি : ১৬ নবম জাতীয় সংসদে মহিলা প্রার্থী

ক্রমিক নং	সংসদীয় আসন	প্রার্থীর নাম	দল/স্বতন্ত্র	ফলাফল
১	ঠাকুরগাঁও-২	শিরিন আক্তার বানু	স্বতন্ত্র	অনির্বাচিত
২	নীলফামারি-৪	মনসুরা রহমান জাহাঙ্গীর মহিউদ্দীন	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	অনির্বাচিত
৩	রংপুর-৬	শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
৪	গাইবান্ধা-২	মাহবুব আরা গিনি	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
৫	গাইবান্ধা-৫	রওশন এরশাদ	জাতীয় পার্টি	অনির্বাচিত
৬	বগুড়া-৬	বেগম খালেদা জিয়া	বিএনপি	নির্বাচিত
৭	বগুড়া-৭	বেগম খালেদা জিয়া	বিএনপি	নির্বাচিত
৮	নওগাঁ-৪	ডা. রওনক জাহান	সিপিবি	অনির্বাচিত
৯	রাজশাহী-৪	জিন্নাতুল ইসলাম জিন্না	ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	অনির্বাচিত
১০	নাটোর-২	সাবিনা ইয়াসমিন	বিএনপি	অনির্বাচিত
১১	সিরাজগঞ্জ-২	জান্নাত আরা হেনরি	আওয়ামী লীগ	অনির্বাচিত
১২	সিরাজগঞ্জ-২	রুমানা মাহমুদ	বিএনপি	অনির্বাচিত
১৩	কুষ্টিয়া-৪	সুলতানা তরুন	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
১৪	ঝিনাইদহ-২	রেহেনা আক্তার হিরা	জাসদ	অনির্বাচিত
১৫	বাগেরহাট-১	শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
১৬	বাগেরহাট-৩	হাবিবুন নাহার	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
১৭	খুলনা-৩	মুন্নুজান সুফিয়ান	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
১৮	বরিশাল-২	সায়মা জলিল	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	অনির্বাচিত
১৯	বরিশাল-৩	সেলিমা রহমান	বিএনপি	অনির্বাচিত
২০	ঝালকাঠি-২	ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো	বিএনপি	অনির্বাচিত
২১	টাঙ্গাইল-২	খালেদা হাবিব	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	অনির্বাচিত
২২	জামালপুর-১	শাহিদা আক্তার রিতা	জাতীয়তাবাদী দল	অনির্বাচিত
২৩	শেরপুর-২	মতিয়া চৌধুরী	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
২৪	ময়মনসিংহ-৪	রওশন এরশাদ	জাতীয় পার্টি	নির্বাচিত
২৫	নেত্রকোনা-৪	রেবেকা মমিন	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত

২৬	মানিকগঞ্জ-২	আফরোজা খান রিতা	বিএনপি	অনির্বাচিত
২৭	মুন্সীগঞ্জ-২	সাগুফতা ইয়াসমিন	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
২৮	মুন্সীগঞ্জ-৩	নাজমুন নাহার বেবি	জাতীয় পার্টি, জেপি	অনির্বাচিত
২৯	ঢাকা-৪	সানজিদা খানম	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
৩০	ঢাকা-৫	নাজমা আক্তার	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	অনির্বাচিত
৩১	ঢাকা-৭	আজমিরি বেগম ছন্দা	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	অনির্বাচিত
৩২	ঢাকা-৭	সাহিদা আমীর	গণফোরাম	অনির্বাচিত
৩৩	ঢাকা-৮	নাসরিন আনোয়ার	স্বতন্ত্র	অনির্বাচিত
৩৪	ঢাকা-৯	জুলেখা হক মৃধা	গণফোরাম	অনির্বাচিত
৩৫	ঢাকা-৯	শিরিন সুলতানা	বিএনপি	অনির্বাচিত
৩৬	ঢাকা-১১	তাহেরা বেগম জলি	বাসদ	অনির্বাচিত
৩৭	ঢাকা-১২	নূরুন নাহার হাবিব	গণফোরাম	অনির্বাচিত
৩৮	ঢাকা-১৪	ফেরদৌসি সুলতানা	গণফোরাম	অনির্বাচিত
৩৯	ঢাকা-১৮	সাহারা খাতুন	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
৪০	ঢাকা-১৯	লীনা চক্রবর্তি	সিপিবি	অনির্বাচিত
৪১	গাজীপুর-১	সালমা রহমান	ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	অনির্বাচিত
৪২	গাজীপুর-৪	ফরিদা ইয়াসমিন	স্বতন্ত্র	অনির্বাচিত
৪৩	গাজীপুর-৫	মেহের আফরোজ চুমকি	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
৪৪	নরসিংদী-৫	ফরিদা ইয়াছমিন	গণফোরাম	অনির্বাচিত
৪৫	নারায়ণগঞ্জ-৪	সারাহ বেগম কবরি	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
৪৬	ফরিদপুর-২	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
৪৭	ফরিদপুর-২	শামা ওবায়েদ	বিএনপি	অনির্বাচিত
৪৮	ফরিদপুর-৪	নিলুফার জাফরউল্লাহ	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
৪৯	গোপালগঞ্জ-৩	শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
৫০	মাদারীপুর-২	হেলেন জেরিন খান	বিএনপি	অনির্বাচিত
৫১	মাদারীপুর-৩	তাসমিন রানা	স্বতন্ত্র	অনির্বাচিত
৫২	সুনামগঞ্জ-৪	মমতাজ ইকবাল	জাতীয় পার্টি	নির্বাচিত

৫৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫	সাবেরা বেগম	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	অনির্বাচিত
৫৪	কুমিল্লা-৪	মাজেদা আহসান	বিএনপি	অনির্বাচিত
৫৫	কুমিল্লা-৫	সাজেদা আরিফ	স্বতন্ত্র	অনির্বাচিত
৫৬	কুমিল্লা-৭	মেহনাজ রশিদ খন্দকার	স্বতন্ত্র	অনির্বাচিত
৫৭	চাঁদপুর-৩	ডা. দীপুমনি	আওয়ামী লীগ	নির্বাচিত
৫৮	ফেনী-১	বেগম খালেদা জিয়া	বিএনপি	নির্বাচিত
৫৯	নোয়াখালী-৩	লুৎফুন্নাহার বেগম	আওয়ামী লীগ	অনির্বাচিত
৬০	নোয়াখালী-৬	আয়েশা ফেরদৌস	স্বতন্ত্র	অনির্বাচিত
৬১	কক্সবাজার-১	হাসিনা আহমেদ	বিএনপি	নির্বাচিত
৬২	কক্সবাজার-৪	শাহীন আক্তার	স্বতন্ত্র	অনির্বাচিত
৬৩	পার্বত্য রাঙামাটি	আলো রানী আইচ	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	অনির্বাচিত
৬৪	পার্বত্য রাঙামাটি	মৈত্রী চাকমা	বিএনপি	অনির্বাচিত

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সারণি : ১৭

২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২৯৯টি আসনে নির্বাচনের তফসিল :

মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ	৩০ নভেম্বর ২০০৮
মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই	৩ এবং ৪ ডিসেম্বর ২০০৮
মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	১১ ডিসেম্বর ২০০৮
নির্বাচন	২৯ ডিসেম্বর ২০০৮

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

২.১৩ নোয়াখালী-১ আসনে নির্বাচন স্থগিত :

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নিজ বাসায় রহস্যজনকভাবে আগুনে পুড়ে মারা যান নোয়াখালী-১ আসনের প্রার্থী এবং গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি নূরুল ইসলাম। ফলে, ঐ আসনে নির্বাচন স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন। নোয়াখালী-১ আসন ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয় নবম জাতীয় সংসদের ২৯৯টি আসনের নির্বাচন। পরে ২০০৯ সালের ১২ জানুয়ারি ঐ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সারণি : ১৮

নবম সংসদ নির্বাচনে স্থগিত হওয়া নোয়াখালী-১ আসনের নির্বাচনের তফসিল :

মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ	২১ ডিসেম্বর ২০০৮
মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই	২২ ডিসেম্বর ২০০৮
মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	২৭ ডিসেম্বর ২০০৮
নির্বাচন	১২ জানুয়ারি ২০০৯

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সারণি : ১৯

২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী-১ আসনে নির্বাচনের ফলাফল :

রাজনৈতিক দল	প্রার্থী	প্রতীক	ভোট	শতকরা হার
বিএনপি	ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন	ধানের শীষ	১ লাখ ৫ হাজার ৩৮০	৫৪.৬৫%
আওয়ামী লীগ	এইচ এম ইব্রাহীম	নৌকা	৮০ হাজার ৬ শ' ৫৮ভোট	৪১.৮৩%

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

২.১৪ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল :

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় আওয়ামী লীগ ২৬৩টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ২৩০টিতে বিজয়ী হয়। বিএনপি ২৫৯টি আসনে প্রার্থী দিয়ে বিজয়ী হয় ৩০টিতে। জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ৪৮টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পায় ২৭টি আসন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ (ইনু) ৭টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৩টিতে বিজয়ী হয়। হাসানুল হক ইনু কুষ্টিয়া-২, মাঈনুদ্দিন খান বাদল চট্টগ্রাম-৮ এবং শাহ আহমেদ জিকরুল ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ আসনে বিজয়ী হন। অন্যদিকে, মহাজোটের শরিক ওয়ার্কার্স পার্টি ৫টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ২টিতে বিজয়ী হয়। দলের সভাপতি রাশেদ খান মেনন ঢাকা-৮ এবং পলিট ব্যুরোর সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা রাজশাহী-২ আসনে নির্বাচিত হলের দলের সাধারণ সম্পাদক বিমল বিশ্বাস নড়াইল-২ আসনে তৃতীয় হন। এই আসনে বিজয়ী হন আওয়ামী লীগের প্রার্থী এস কে আবু বাকের, আর দ্বিতীয় হন বিএনপি'র শরীফ খসরুজ্জামান। এদিকে, বিএনপি'র সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক মিত্র জামায়াতে ইসলামী ৩৯টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পায় ২টি আসন। চট্টগ্রাম-১০

আসনে মাওলানা শামসুল ইসলাম এবং কক্সবাজার-২ আসনে হামিদুর রহমান আজাদ নির্বাচিত হন। বিএনপি'র আমলে সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন বিকল্পধারা ৬৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েও কোন আসন পায়নি; বি. চৌধুরী ও তার একমাত্র ছেলে (দলের যুগ্ম মহাসচিব) মাহি বি চৌধুরী দু'জনেই পরাজিত হন। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী'র (বীরউত্তম) নেতৃত্বাধীন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ৫৭টি আসনে প্রার্থী দিয়েও কোন আসন পায়নি। ঢাকার সাবেক মেয়র প্রয়াত নাজিউর রহমান মঞ্জুর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, বিজেপি ২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পায় ১টি আসন। ভোলা-১ আসনে নাজিউর রহমানের বড় ছেলে বিজেপি'র চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ বিজয়ী হন; তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন। ভোলা-২ আসনে বিজেপি'র আরেক প্রার্থী ও নাজিউর রহমানের আরেক ছেলে আশিকুর রহমান হেরে যান বরেন্য রাজনীতিবিদ ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য তোফায়েল আহমেদের কাছে। এদিকে, কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন এলডিপি পায় চট্টগ্রাম-১৪ আসনে পায় ১টি, আর ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল আজিমসহ ৪ জন বিজয়ী হন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে। নবম জাতীয় সংসদের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত শেখ হাসিনা। বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন আব্দুল হামিদ অ্যাডভোকেট এবং কর্নেল (অব.) এম শওকত আলী।

সারণি : ২০

এক নজরে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটের পরিসংখ্যান : (৩০০ আসনে)

দল	আসন	ভোট	প্রতীক	শতাংশ
আওয়ামী লীগ	২৩০	৩ কোটি ৩৬ লাখ ৩৪ হাজার ৬২৯	নৌকা	৪৮.০৪ %
বিএনপি	৩০	২ কোটি ২৭ লাখ ৫৭ হাজার ১০১	ধানের শীষ	৩২.৫০ %
জাতীয় পার্টি	২৭	৪ কোটি ৮৬ লাখ ৭ হাজার ৩৭৭	লাঙ্গল	৭.০৪ %
জাসদ (ইনু)	৩	৫ লাখ ৬ হাজার ৬০৫	মশাল	০.৭২ %
জামায়াতে ইসলামী	২	২৬ লাখ ২ হাজার ৯৩	দাঁড়িপাল্লা	৪.৭০ %
ওয়ার্কার্স পাটি	২	৩২ লাখ ৮৯ হাজার ৯৬৭	হাতুড়ি	০.৩৭ %
এলডিপি	১	১ লাখ ৯১ হাজার ৬৮৯	ছাতা	০.২৭ %
বিজেপি	১	১ লাখ ৮১ হাজার ৬৭৫	ধানের শীষ	০.২৫ %
স্বতন্ত্র	৪	২০ লাখ ৬০ হাজার ৩৯২		২.৯৪ %
না ভোট		৩ লাখ ৮১ হাজার ৯২৪		০.৫৫ %

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সারণি : ২১

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভাগওয়ারি ভোটের ফলাফল :

বিভাগ	আ.লীগ	বিএনপি	জেপি	জাসদ	জামায়াত	ওয়াকার্স পার্টি	বিজেপি	এলডিপি	স্বতন্ত্র	মোট
বরিশাল	১৬	২	২	০	০	০	১	০	০	২১
চট্টগ্রাম	৩২	১৮	২	২	২	০	০	১	১	৫৮
ঢাকা	৮৭	০	৫	০	০	১	০	০	১	৯৪
রাজশাহী	৪৮	৮	১৪	০	০	১	০	০	১	৭২
খুলনা	৩০	২	২	১	০	০	০	০	১	৩৬
সিলেট	১৭	০	২	০	০	০	০	০	০	১৯
মোট	২৩০	৩০	২৭	২	২	২	১	১	৪	৩০০

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সারণি : ২২

নবম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত ৫০টি মহিলা আসন :

রাজনৈতিক দল	আসন
আওয়ামী লীগ	৩৯
বিএনপি	৫
জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	৪
গণতন্ত্রী পার্টি	১
ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর)	১

সূত্র : জাতীয় সংসদ সচিবালয়

সারণি : ২৩

জাতীয় সংসদের পর্যায়ক্রমিক ৯টি নির্বাচন :

নির্বাচন	সাল	তারিখ
প্রথম	১৯৭৩	৭ মার্চ
দ্বিতীয়	১৯৭৯	১৮ ফেব্রুয়ারি
তৃতীয়	১৯৮৬	৭ মে
চতুর্থ	১৯৮৮	৩ মার্চ
পঞ্চম	১৯৯১	২৭ ফেব্রুয়ারি
ষষ্ঠ	১৯৯৬	১৫ ফেব্রুয়ারি
সপ্তম	১৯৯৬	১২ জুন
অষ্টম	২০০১	১ অক্টোবর
নবম	২০০৮	২৯ ডিসেম্বর

সূত্র : জাতীয় সংসদ নির্বাচন হ্যান্ডবুক, আরএফইডি

২.১৫ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পটভূমি :

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উপজেলা হচ্ছে দ্বিতীয় নিম্নস্তর। ১৯৮২ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের শাসনামলে থানাকে উপজেলা পরিষদে রুপান্তরিত করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ''আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।'' প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারিদের কার্যক্রম পরিচালনা, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, সকল সরকারি সেবা ও বিতরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন স্থানীয় সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা, নাগরিকদের সেবা প্রদান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রায় সকল কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কথা। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করার জন্য অবশ্যই এগুলোকে শায়ত্ত্বশাসন ও প্রয়োজনীয় সম্পদ দিতে হয়। বাংলাদেশে প্রথম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে। সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের জাতীয় পার্টির শাসনামলে ১৯৮৫ সালে প্রথম ও ১৯৯০ সালে দ্বিতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের আমলে তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৫ সালের প্রথম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন :

১৯৮৫ সালে দেশে প্রথমবারের মতো উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ ও ২০ মে তারিখে ৩৪০টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১৪৪ জন প্রার্থী বিজয়ী হয়। যাদের ভোটের গড় ৪২.৩৫ শতাংশ। ফলাফলের দিক দিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলো আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থীরা। তারা পায় ৯১টি আসন, গড় ভোটের হার ২৬.৭৬ শতাংশ। ভোটের ফলাফলে তৃতীয় অবস্থানে ছিলো স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। মোট ৩৮ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হন যাদের ভোটের হার ১১.১৮ শতাংশ। জামায়াত সমর্থিত ২১ জন উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনে বিজয়ী হয় যাদের ভোটের হার ছিলো ৬.১৮ শতাংশ; আর বিএনপি সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থীরা ১৬টি উপজেলায় বিজয়ী হয় যাদের ভোটের হার ৪.৭১ শতাংশ।[২৮] ঐ নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরুপ :

সারণি : ২৪

প্রথম উপজেলা নির্বাচনের ফলাফল :

দল	আসন সংখ্যা
জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	১৪৪
আওয়ামী লীগ	৯১
স্বতন্ত্র	৩৮
জামায়াতে ইসলামী	২১
বিএনপি	১৬
জাসদ (রব)	৭
বাকশাল	৫
মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	৪
জাসদ (ইনু)	২
জাসদ (সিরাজ)	২
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	২
কমিউনিস্ট লীগ	২
জাকের পার্টি	২
ন্যাপ	১
মুসলিম লীগ	১
বিএনপি (ওবায়েদ)	১
ডেমোক্রেটিক লীগ	

সূত্র : বৃত্ত ও বৃত্তান্ত বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় শাসন, রাজনীতি ও উন্নয়ন ভাবনা, তোফায়েল আহমেদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃষ্ঠা ৫৪।

২.১৫.২ দ্বিতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন :

সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের শাসনামলে ১৯৯০ সালের ১৪ থেকে ১৯ মার্চ এবং ২০ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত দুই দফায় দ্বিতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে হয় ৩৪০টি উপজেলায়। নির্বাচনকালীন সংঘাতে প্রায় ২০০০ লোক (কম-বেশি) আহত আর ৪০ জন নিহত হয়। ১৬০টি সন্ত্রাসের ঘটনায় অস্ত্রের ব্যবহার হয়। আর প্রায় ৫০০ জনকে গ্রেফতার করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী। ২৬টি ঘটনায় অগ্নিসংযোগ ও ১৬টি যানবাহন বিনষ্ট হয়। ঐ সময়ে হরতাল হয়েছে প্রায় ২০ দিনের মতো। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায়, প্রথম ৬ দিনের ফলাফলে বিরোধীদল অনেক এগিয়ে থাকলেও পরের ৪ দিনের ফলাফলে পিছিয়ে যায়।[২৯]

২.১৫.৩ তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ২০০৯ :

২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য ৪৮১টি উপজেলার তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম ও সহিংসতার কারণে ৫টি উপজেলায় নির্বাচন স্থগিত করা হয় যেগুলোতে পরে নির্বাচন হয়। ২২ জানুয়ারিতে ৪৭৬টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৭ কোটি ৩৫ লাখ ১৭ হাজার ৮৪৯ জন ভোটার নির্বাচনে ভোট দেয়। সারাদেশে ভোট কেন্দ্র ছিলো ৩২৩৫৬টি। তৃতীয় উপজেলা নির্বাচনে সারাদেশে ৪৮১টি উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে ৩ হাজার ৩১৬ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২ হাজার ৮৭৯ জন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১ হাজার ৯৩৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে ৮ হাজার ১৩১ জন প্রার্থী ছিলেন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে। চেয়ারম্যান পদে ২ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৯ জন অর্থাৎ ১৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।[৩০]

রুপগঞ্জ ও হবিগঞ্জ সদর উপজেলার চেয়ারম্যান প্রার্থী, অটোয়ারি, পবা ও নালিতাবাড়ি উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী এবং বোচাগঞ্জ, আদিতমারি, বেড়া, আলমডাঙ্গা, চরফ্যাশন, রাজাপুর, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, জৈন্তাপুর ও মহালছড়ি উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। নির্বাচনে খাগড়াছড়ির দিঘীনালায় একজন চেয়ারম্যান প্রার্থীকে জোর করে প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে। ফলে, নির্বাচন কমিশন ঐ উপজেলায় নির্বাচন স্থগিত করে। এছাড়া, নির্বাচন কমিশন সহিংসতার কারণে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি, লক্ষীপুরের রামগঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়িয়া সদর উপজেলা, কক্সবাজারের উখিয়া ও কুমিল্লার বড়ুড়ায় নির্বাচন স্থগিত করে। অর্থাৎ ৪৮১টি উপজেলার মধ্যে ৫টি উপজেলায় নির্বাচন স্থগিত হয় আচরণবিধি লঙ্ঘন ও সংঘাতের কারণে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণকরতে প্রায় ৫ লাখ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী মোতায়েন করা হয়। এর মধ্যে প্রায় ৩৮ হাজার ছিলো আর্মড ফোর্সের সদস্য। পাবনার

বেড়া উপজেলায় নির্বাচনী সহিংসতায় ২২ জন আহত হয়। ১৮টি উপজেলায় নির্বাচনী সংঘাতে ৯২ জন আহত হয়। এছাড়া ভোলা, পাবনা, চাঁদপুর, বরগুনা, মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, বাগেরহাট, খুলনা, পটুয়াখালী, শেরপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সিলেট, নিলফামারি ও ঢাকার কেরানিগঞ্জের উপজেলা নির্বাচনে সংঘাত হয়। তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান পদে প্রার্থীদের নিজের ও নির্ভরশীলদের সম্পর্কে ৭ ধরনের ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্য হলফনামা আকারে মনোনয়নত্রের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে দাখিল করতে হয়েছে। এছাড়া, প্রার্থী আয়কর দাতা হলে সর্বশেষ দাখিল করা আয়কর রিটার্নের কপি, সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয়ের উৎসসমূহ ও প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি দাখিল করা বাধ্যতামূলক করা হয়।

তথ্য নির্দেশ :

১. ফকির-সন্নাসী বিদ্রোহ : মুসলিম ও হিন্দু ফকিররা তাদের জীবন ও জীবীকার জন্য ঐতিহ্যগতভাবে মুষ্টি ভিক্ষার মাধ্যমে জীবন যাপন করতো। তারা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে লাঠি বা ত্রিশূল-শিকল সজ্জিত হয়ে গ্রামে-গঞ্জে গৃহস্থদের বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষা করতো। ইংরেজ শাসকরা মুষ্টি ভিক্ষায় বাধা দেয় ও ফকিরদের দলবদ্ধভাবে গ্রামে-গঞ্জে ঘোরা-ফেরা নিষিদ্ধ করে। এছাড়া, মসজিদ ও মন্দিরে রাষ্ট্রীয় অনুদান দেয়া বন্ধ করে দেয় ইংরেজ সরকার। প্রতিবাদে ফকির-সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা ঘোষণা করে। ফকিররা ইংরেজ বণিক ও জমিদারদের কুঠিতে সশস্ত্র আক্রমন করে। ঐ বিদ্রোহের নেতা ফকির মজনু শাহ। তার খানকা ছিলো ভারতের বিহার রাজ্যের কানপুর জেলায়। তার মুরিদদের বিরাট এক অংশ বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে বাস করতো। মজনু শাহের নেতৃত্বে ১৭৬০ সালে ফকির বিদ্রোহ শুরু হয়ে বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৮৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে মজনু শাহ পরাজিত ও নিহত হলে ফকির আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিদ্রোহের সমাপ্তি হয়। মজনুর মৃত্যুর পর যে সব ফকির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন তারা হলেন : মুসা শাহ, শাহ বাহাদুর, কালু ফকির, চেরাগ আলী শাহ ও করিম শাহ। ফকির বিদ্রোহের সময় সন্নাসীরাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এতে নেতৃত্ব দেন ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী, কৃপানাথ, শ্রী নিবাস প্রমুখ।

সূত্র : বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ড. আবুল ফজল হক, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ২৪-২৫।

২. তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা : সৈয়দ মীর নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) এর জন্ম পশ্চিম বাংলার চবিক্ষশ পরগনা জেলার বারাসাতে। বাল্যকালে তিনি হজ্ব করতে গিয়ে উত্তর-ভারতের ওহাবি আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর সান্নিধ্যে আসেন। এর পর তিতুমীর সংগ্রামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। একদিকে তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন অন্যদিকে জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশ শাসকদের জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষক, তাতী ও কারিগর শ্রেণীর মানুষদের সংগঠিত করেন। বিভিন্ন সময় অত্যাচারি জমিদার-নীলকর ও ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে তিতুমীরের বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। চূড়ান্ত যুদ্ধ হয় বারাসাতের নারকেলবাড়িতে। তিতুমীর বাঁশের কেল্লা তৈরী করে ইংরেজ বাহিনীর আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ কর্নেল স্টুয়াটের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বাহিনীর কামানের গোলার আঘাতে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়। ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর এ যুদ্ধে প্রায় জনা পঞ্চাশেক যোদ্ধাসহ তিতুমীর শহীদ হন। তার সহযোদ্ধা গোলাম মাসুদসহ প্রায় সাড়ে তিনশ জনের মতো যোদ্ধা ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে আটক হয়। পরে মাসুদকে ফাঁসি দেয়া হয় আর বাকিদের বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেয়া হয়। এভাবে তিতুমীরের কৃষক বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

সূত্র : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, তারিক হোসেন খান, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৫২-৫৪।

৩. সিপাহী বিদ্রোহ : ১৮৫৭ সালের ১০ মে ভারতের মিরাট শহরে শুরু হওয়া ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সিপাহিদের বিদ্রোহ। এটি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন; আর ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ নামে খ্যাত। বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন ভারতের শেষ স্বাধীন নবাব বাহাদুর শাহ জাফর। ১৮৫৭ সালে ইংরেজ শাসনামলে সেনাবাহিনীতে গুজব রটে যে, এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজের মধ্যে গরু ও শুয়োরের চর্বি আছে। কার্তুজ দাত দিয়ে খুলতে হতো; সিপাহিরা ভাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জাত নষ্টের জন্য ইংরেজরা পরিকল্পিতভাবে কার্তুজে চর্বি ঢুকিয়েছে। ফলে, বহরমপুর ও ব্যারাকপুরে সিপাহিরা কার্তুজ ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানায়। ব্যারাকপুরে মঙ্গলপাণ্ডে নামে এক সিপাহি ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ প্রকাশ্যে ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহ ক্রমেই গোটা উত্তর ও মধ্য ভারতে (অধুনা

উত্তর প্রদেশ, বিহার, উত্তর মধ্যপ্রদেশ ও দিলণ্টী অঞ্চল), কানপুর, বুন্দেলখন্ড, এলাহাবাদ, রোহিলাখন্ড, ফতেহপুর, বিহার, চট্টগ্রাম, কলকাতা, ঢাকা, যশোর ও দিনাজপুরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৮ সালের ২০ জুন গোয়ালিয়রে বিদ্রোহীদের পরাজিত করে ইংরেজ সেনাবাহিনী; বিদ্রোহ দমনের নামে হত্যা করে অসংখ্য সিপাহীকে। এই বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত। ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাই, মারাঠা নেতা নানাসাহেব, মৌলভী লিয়াকত আলী, মৌলভী আহমদ উল্লাহ, তুলসিপুরের ঈশ্বরী কুমারি দেবী প্রমুখ সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেন। সিপাহিরা জেল ভেঙ্গে কয়েদিদের মুক্ত করে, খাজাঞ্চীখানা লুট করে এবং ব্রিটিশদের আক্রমন করে। ভারতের গর্ভনর জেনারেল লর্ড ক্যানিং সিপাহি ও জনতার ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম দমনের জন্য দরকারি সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তবে শিক্ষিত বাঙালি ও শিক্ষিত মুসলমান, শিখ, পাঠান, পাঞ্জাবি ও আশ্রিত নৃপতিরা বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করে এবং সিপাহিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়। আধুনিক অস্ত্র, যুদ্ধ কৌশল, দ্রুত যোগাযোগ কৌশল ও ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন তৈরী করে ইংরেজরা যুদ্ধে বিজয়ী হয়। আর পরাজয়ের পর বিদ্রোহীদের নেতা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠায় ইংরেজ সরকার। অন্যদিকে, ঝাঁসির রাণী যুদ্ধে নিহত হন; নানা সাহেব আশ্রয় নেন নেপালের জঙ্গলে। অসংখ্য বিদ্রোহীদের ফাঁসি ও কারাদণ্ড দেয়া হয়। বিদ্রোহের অভিযোগে অগণিত সিপাহিকে ফাঁসি দেয়া হয় ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে। যুদ্ধে বিদ্রোহীদের কৌশলগত অনেক ভুল ছিলো। বিদ্রোহে ব্যর্থতার পর ১৮৫৮ সালের নভেম্বরে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের চির অবসান ঘটে এবং কোম্পানির বদলে ভারতে ব্রিটেনের রাণীর সরাসরি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতীয় প্রজাদের শাসন ব্যবস্থায় আরো বেশি পরিমাণে অংশগ্রহণ করার নীতি ঘোষণা করেন।

সূত্র : বাঙালির ইতিহাস (প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত), ড. মোহাম্মদ হাননান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা ১২০-১২২।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, তারিক হোসেন খান, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৫৮-৬৩।

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ড. আবুল ফজল হক, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ২৯-৩২।

৪. ফরায়েজী আন্দোলন : ইংরেজদের শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার জন্য হাজী শরিয়তুল্লাহ সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলেন। সে জন্য ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষকে দারুল হারব বা বিধর্মীর রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করেন। হাজী শরিয়তুল্লাহ ঘোষণা করেন, ‘‘জমির মালিক আল্লাহ, তাই জমির খাজনা নেয়ার অধিকার মানুষের নাই।’’ তিনি জমিদারদের খাজনা না দিতে কৃষকদের প্রতি আহক্ষান জানান। তার সেই আন্দোলন ফরায়েজী আন্দোলন নামে পরিচিত। শরিয়তুল্লাহর শোষণ ও নির্যাতনবিরোধী সাম্যের বাণী সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিলো। তার নেতৃতে ফরায়েজী আন্দোলন ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শরিয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর ছেলে মহসিন উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ফরায়েজী আন্দোলনের সময় আলাদা বিচার ব্যবস্থা ছিলো। মূলত সরকারি প্রশাসনের বাইরে দুদু মিয়া নিজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি অত্যাচারি জমিদার নীলকরদের মোকাবেলায় সুশৃঙ্খল ‘লাঠিয়াল বাহিনী’ গড়ে তোলেন। সারা বাংলায় প্রায় ৫০ হাজার থেকে ৮০ হাজারের মতো বিশাল ফরায়েজী বাহিনী ছিলো।

সূত্র : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, তারিক হোসেন খান, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৫১-৫২।

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ড. আবুল ফজল হক, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ২৭-২৯।

৫. নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) : ভারতের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ; স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সিপাহসালার। নেতাজি নামে পরিচিত এই বাঙালি ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতি হন। কিন্তু দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আরেক কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আদর্শীক দ্বন্দ্ব এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করায় নিজ দলে চরম বিরোধীতার মুখে পড়েন। বিশেষ করে নেতাজী দ্বিতীয়বার দলের সভাপতি নির্বাচিত হলে মহাত্মা গান্ধী বিরোধীতা করেন। দল ভাঙ্গার আশংকায় নেতাজী কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন এবং 'অল ইন্ডিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ইংরেজদের নির্যাতন ও নিপিড়নের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস মতবাদের বিপরীতে নেতাজী সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে বিপ্লবের মন্ত্রে দিক্ষিত হয়েছিলেন। ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলনের কারণে তাকে ১১ বার জেল খাটতে হয়। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রেঙ্গুন ও ইউরোপে নির্বাসনে পাঠায়। নেতাজীর বিখ্যাত উক্তি ''তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।'' ভারতকে ইংল্যান্ডের অধীরাজ্য বা ডোমিনিয়ন স্টেট করার পক্ষে আইন হলে কংগ্রেস মেনে নেয়; যদিও এর অনেক আগে থেকেই নেতাজী ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেন। নেতাজীর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন ভারতের উগ্র জাতীয়তাবাদি নেতা চিত্তরঞ্জন দাস। দেশবন্ধু যখন কলকাতার মেয়র, তখন সুভাষ বসু তার অধীনে কাজ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সময়ে নেতাজীকে ব্রিটিশ সরকার ভারতে গৃহবন্দী করে রাখে। তিনি সেখান থেকে পালিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যান; সেখান থেকে জার্মানিতে। সুভাষ বসু ১৯৪৩ সালে জার্মানিতে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে সশস্ত্র বিপ্লবী রাজনৈতিক দল গঠন করেন। সেখানে দেশটির চ্যান্সেলর এডলফ হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন; ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ফরোয়ার্ড ব্লকের পক্ষে জার্মানির রাজনৈতিক ও সামরিক সাহায্য চান। পরে তিনি জার্মানি থেকে জাপানে যান এবং রাস বিহারী বসুর সঙ্গে মিলে যৌথ বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনীর অধীনে ছিলো ৬০ হাজার ভারতীয় সৈন্য ও ১৫ শত অফিসার। নেতাজী ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর স্বাধীন ভারতের পক্ষে অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। ১৯৪৪ সালের ১৮ মার্চ ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' ভারত আক্রমন করে মণিপুর রাজ্য ও বার্মার আরাকানে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪৫ সালের ১৬ অগাস্ট সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাংকক হয়ে টোকিও যাওয়ার পথে রহস্যজনকভাবে কথিত বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান ভারতের এই মহান বিপ্লবী।

সূত্র : নেতা থেকে নেতাজী, অমলেশ ত্রিপাঠী, সম্পাদনা শেখ রফিক, বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৮।
বাঙালির ইতিহাস (প্রাচীণ যুগ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত), ড. মোহাম্মদ হাননান, আগামী প্রকাশনী, ২০১২,পৃষ্ঠা ১৩৮।

৬.ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি : ভারতে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ১৬০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডে একদল বণিক গঠন করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। রাণী প্রথম এলিজাবেদ কোম্পানিটিকে রাজকীয় সনদ দেয়। কোম্পানিটি ২১ বছর পূর্ব ভারতে ব্যবসা করে; কিন্তু পরে কেন্দ্রীয় ব্রিটিশ সরকারের মদদে ভারতে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে নেয়। একটি ব্যবসায়ীক কোম্পানি হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় উপমহাদেশকে শাসন-শোষন ও নির্যাতনের মাধ্যমে ব্যবসায়ীক ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করে। ১৬৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন প্রতিনিধি হিসেবে জেমস হার্ট ঢাকায় ঢোকার মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজ আগমন শুরু। ১৭১৫ সালে মুঘল দরবার থেকে এই কোম্পানিকে নিজস্ব মুদ্রা তৈরী ও ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ব্রিটিশরা ভারতে ভারতীয় ও বাঙালিদের 'ভাগ কর' এবং 'শাসন কর' এই নীতির মাধ্যমে এই উপমহাদেশ শাসন করে। এর মাধ্যমে তারা ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরী করতে সমর্থ হয়। ভারতে এই কোম্পানির স্বার্থে ১৭৬৫ সালে বাংলার কৃষি পণ্যকে বাণিজ্যিকীকরণ, ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ, ১৮১৩

সালে ভারতে ফ্রি ট্রেড প্রবর্তন একই বছরে প্রধান শিল্প খাত টেক্সটাইল রপ্তানি বন্ধ, ১৮২০ সালে টেক্সটাইলকে আমদানি পন্য হিসেবে ঘোষণা, ১৮৩০ সালে কলকাতায় ডকিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা, ১৮৩৫ সালে ইংরেজিকে সরকারি অফিস-আদালতের ভাষা হিসেবে ঘোষণা, ১৮৩৮ সালে বেঙ্গল বন্ডেড ওয়্যার হাউস অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা, ১৮৪০ সালে বেসরকারি খাতে চা বাগান তৈরীর উদ্যোগের মাধ্যমে এই অঞ্চলের স্বনির্ভর অর্থনীতিকে পরনির্ভর করে তোলে এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির কার্যক্রম গুটিয়ে নেয় এবং ভারতে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সূত্র : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, তারিক হোসেন খান, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮।

৭. শেরে বাংলা একে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) : বরিশাল জেলার চাখার পৈত্রিক বাড়িতে জন্মগ্রহণ করা আবুল কাশেম ফজলুল হক কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন, পদার্থ ও অংক শাস্ত্রে অনার্স করেন। এরপর মাস্টার্স করেন গণিতশাস্ত্রে; সবশেষ নেন আইনের ডিগ্রি। পত্রিকা সম্পাদনা থেকে শুরু করে কলেজে অধ্যাপনা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর, সহকারি রেজিস্ট্রার সব কাজই করেছেন। পরে অবশ্য চাকরি ছেড়ে দিয়ে জনগনকে সেবার মানষে রাজনীতিতে মনোনিবেশ করেন। শেরে বাংলা হিসেবে খ্যাত ফজলুল হক ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন। পরে পাকিস্তান গণপরিষদ ও জাতীয় পরিষদেরও সদস্য নির্বাচিত হন। সাধারণ মানুষের কাছে ভীষণ জনপ্রিয় শেরে বাংলা ছিলেন কলকাতার প্রথম মুসলিম মেয়র (১৯৩৫); দু'দফায় অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৩৭-১৯৪১) ও (১৯৪১-৪৩), পূর্ব বাংলার অ্যাডভোকেট জেনারেল, পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল), পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (১৯৫৫) এবং পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নর (১৯৫৬-৫৮) ছিলেন। তিনি ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন করেন; আর ১৯৩৬ সালে প্রজা সমিতিকে কৃষক প্রজা পার্টিতে রুপ ান্তরিত করেন। কৃষক প্রজা পার্টি ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। শেরে বাংলা ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানে পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হবে।
সূত্র : বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), ড. হারুন-অর-রশীদ, নিউএজ পাবলিকেন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫২।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, ভাস্কার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩।

৮.হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী : গণতন্ত্রের মানষপুত্র হিসেবে খ্যাত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৮২ সালে পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন কলকাতার ডেপুটি মেয়র। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে। নির্বাচনে শেরে বাংলার নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি যুক্তফ্রন্ট ১১ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করলে সোহরাওয়ার্দী বাণিজ্য, শ্রম ও স্থানীয়সরকার মন্ত্রী হন। বাংলায় শেরে বাংলার মন্ত্রিসভার পতন হলে মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করেন; সোহরাওয়ার্দী ঐ মন্ত্রিসভারও সদস্য হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে যান। পরে পাকিস্তানে মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৬-৫৭) নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পর সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের

সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিন হন। তাকে সমর্থন করেন তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম লীগ সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম ও মুসলিম লীগের মধ্যবিত্ত অংশ। তার উদ্যোগে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হন মাওলানা ভাসানী। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কলকাতা থেকে দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকা প্রকাশিত হতো; পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে শেরে বাংলা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনকালে ঐ দলে ছিলেন সোহরাওয়ার্দী। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক গুরু। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর লেবাননের রাজধানী বৈরুতের একটি হোটেলে নিস্বঙ্গ অবস্থায় মারা যান।
সূত্র : বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), ড. হারুন-অর-রশীদ, নিউএজ পাবলিকেন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৫।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।

৯. মুসলিম লীগ : ১৯০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দোক্তা ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের প্রভাবশালী সদস্য খাজা স্যার সলিমুল্লাহ। কংগ্রেসে কোনঠাসা হয়ে থাকা মুসলিম নেতারা ও ভারতবর্ষের আপামর মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পণ্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে ওঠে এই রাজনৈতিক সংগঠন। এই দলের নেতা ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী, আবুল হাশিম, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, লিয়াকত আলী খানসহ প্রমুখ ব্যক্তিরা। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয়ে এই সব নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম লীগে দুটি অংশ ছিলো। প্রগতিশীল অংশে ছিলেন সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের মতো নেতারা; অন্যদিকে কট্টর অংশে ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন ও মাওলানা আক্রাম খানসহ অন্যান্যরা। নাজিমউদ্দিন ও আক্রাম খানদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও পাকিস্তানে অন্যতম ধনাঢ্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইস্পাহানি গ্রুপ।
সূত্র : বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), ড. হারুন-অর-রশীদ, নিউএজ পাবলিকেন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৫।

১০. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ২২৮।

১১. বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), ড. হারুন-অর-রশীদ, নিউএজ পাবলিকেন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ১০০-১০৫।

১২. বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ (১৮৬১-২০০৮), হারুন-অর-রশিদ হাসিনা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭।

১৩. স্যার নবাব সলিমুল্লাহ : ১৮৭১ সালের ৭ জুন ঢাকার নবাব পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও তিনি জড়িত ছিলেন। তার উদ্যোগে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে ১৯০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিনি ভারতে মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯১৫ সালের ১৬ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। সূত্র : বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), ড. হারুন-অর-রশীদ, নিউএজ পাবলিকেন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ১৪৭-১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. গাইন, ফি. (সম্পাদিত) (২০০৮) সাংবাদিক সহায়িকা তথ্যপঞ্জী নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের পটভূমি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য; সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা, পৃষ্ঠা ১২৩।

১৫. দৈনিক আজাদ : ভারতের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও শিক্ষানুরাগী মাওলানা আকরাম খাঁ ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর কলকাতা থেকে আজাদ পত্রিক প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি মুসলমানদের স্বার্থ, ভারত থেকে আলাদা হয়ে পাকিস্তান আন্দোলন এবং বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খবরে জোর দিতো। মুসলমানদের কাছে খুবই জনপ্রিয় পত্রিকা ছিলো এটি। মূলত আজাদ ছিলো মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে দৈনিক আজাদ মুসলিম লীগের পক্ষে সংবাদ প্রচার করে আজাদ বের হতো কলকাতা থেকে। যদিও নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে শোচনীয় পরাজিত হয় মুসলিম লীগ। আজাদের এর শেষ সংখ্যা বের হয় ১৯৪৮ সালের ১২ অক্টোবর। পত্রিকার ঐ সংখ্যায় উল্লেখ করা হয় যে, এর পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশ হবে ১৯ অক্টোবর ঢাকা থেকে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর ঢাকেশ্বরী রোডের ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয় ঢাকাভিত্তিক দৈনিক আজাদ পত্রিকা, যার সম্পাদক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

সূত্র : রিপোর্টিং, সুধাংশু শেখর রায়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১১, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৬৫-৭৮ ।

১৬. যুক্তফ্রন্ট : পাকিস্তান আমলে ১৯৫৪ সালের মার্চে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী কৌশল হিসেবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়েছিলো। সে সময় প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিলো এর উদ্যোক্তা। ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে নতুন রাজনৈতিক জোট যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ঐ অনুযায়ী ডিসেম্বরে সমমনা কিছু দল নিয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে নতুন নির্বাচনী জোট গঠন হয়। শরিক দলগুলো ছিলো : আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরে বাংলার কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মাওলানা আতাহার আলীর নিজাম-ই-ইসলাম, আবুল হাশিমের খেলাফতে রবক্ষানী পার্টি, হাজী দানেশের গণতন্ত্রী দল। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, শেরে বাংলা ফজলুল হক ও আওয়ামী মুসলিম লীগের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট গঠনে জোরালো ভূমিকা রাখেন। নির্বাচনে বিজয়ী হতে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। যুক্তফ্রন্ট গঠনের ফলে নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অবিশ্বরণীয় বিজয় হয়। নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২২৮টি আসনের মধ্যে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যুক্তফ্রন্ট ২০৬টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে, ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন।

সূত্র : বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), ড. হারুন-অর-রশীদ, নিউএজ পাবলিকেন্স, ২০০১, পৃষ্ঠা ১৮৫-১৯৪।

বাঙালির ইতিহাস (প্রাচীণ যুগ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত), ড. মোহাম্মদ হাননান, আগামী প্রকাশনী, ২০১২, পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৯।

১৭. বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), ড. হারুন-অর-রশীদ, নিউএজ পাবলিকেন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৯।

১৮. মর্নিং নিউজ : পাকিস্তান মুসলিম লীগের সমর্থক ইংরেজি পত্রিকা ছিলো মর্নিং নিউজ। দেশ বিভাগের আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। তখন মূলত পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশি খবর প্রকাশ করতো পত্রিকাটি। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মর্নিং নিউজ মুসলিম লীগের পক্ষে সংবাদ প্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পত্রিকাটি কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসে। মর্নিং নিউজ ছিলো প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও এই পত্রিকা বের হতো এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষে সংবাদ প্রকাশ করেছে।

সূত্র : রিপোর্টিং, সুধাংশু শেখর রায়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১১, পৃষ্ঠা ১৭।

১৯. বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), ড. হারুন-অর-রশীদ, নিউএজ পাবলিকেন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ২২২-২২৪।

২০. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, ১৯৯৭, ভাস্কর প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৩৬৫।

২১. ছয় দফা : বাঙালির জাতীয় মুক্তির সনদ ছয় দফা আন্দোলন; একে ম্যাগনাকার্টা বলা হতো। ভারত থেকে পাকিস্তান আলাদা হওয়ার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিরা শোষনের স্টিম রোলায় চালায়। তারা শিক্ষা, চাকুরি, নিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রে বাঙালিদের বঞ্চিত করেছে। বাঙালিরা কখনো সমঅধিকার পায়নি। পাকিস্তানে বাঙালিদের মূল সমস্যা ছিলো জাতিসত্তাভিত্তিক। এটি অনুধাবন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানে লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন।

দফা ১ : লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র। সর্বজনীন ভোটাধীকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্যসহ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দফা ২ : বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা ছাড়া সকল বিষয় অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশের হাতে ন্যাস্ত থাকবে। উলিণ্ঢখিত দু'টি বিষয় ন্যস্ত থাকবে কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে।

দফা ৩ : পাকিস্তানে দু'টি অঞ্চলের জন্য পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। অথবা সমগ্র দেশে একটি মুদ্রা ব্যবস্থা থাকবে, তবে সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার রোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য একটি ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে কার্যকরি ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দফা ৪ : অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশগুলোর কর বা শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে। তবে ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর একটি অংশ পাবে।

দফা ৫ : পাকিস্তানে দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পৃথক হিসাব রাখা হবে। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্ব স্ব অঞ্চলের বা অঙ্গরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আঞ্চলিক সরকার বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং যে কোন চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

দফা ৬ : নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ প্যারামিলিশিয়া বা আধাসামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে।

সূত্র : বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, ড. হারুন-অর-রশীদ, নিউ এজ পাবলিকেসন্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ২৬১-২৬২।

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ড. আবুল ফজল হক, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৬।

২২. রেসকোর্স ময়দান : স্বাধীনতা যুদ্ধের পর নামকরণ পরিবর্তন হয়েছে; বর্তমানে এটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে বিশাল এলাকা জুড়ে এই উদ্যান। ব্রিটিশ আমলে এখানে ঘোড় দৌড় হতো বলে নামকরণ হয়েছিলো রেসকোর্স ময়দান। এই ময়দানে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বিকেলে বিশাল জনসভায় ১৮ মিনিটের ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। আর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান সেনাপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকারসহ ভারতীয় ও বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তা, দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনী নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের প্রধান লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী আত্মসমর্পন দলিলে স্বাক্ষর করেন।

সূত্র : বাংলা উইকিপিডিয়া http://bn.wikipedia.org/wiki

২৩. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ : ১৯৭২ সালের অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত হয় দলটি। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে ৯ নেম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিপি ও মুক্তি বাহিনীর অন্যতম ছাত্রনেতা আ স ম আব্দুর রব ও আরেক ছাত্রনেতা শাহজাহান সিরাজ। ১৯৭২ সালের ২৬ ডিসেম্বর দলের প্রথম কাউন্সিলে এম এ জলিল সভাপতি নির্বাচিত হন।

২৪. আতাউর রহমান খান (১৯০৭-১৯৯১) : ঢাকা জেলার ধামরাইয়ের বালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৮ সালের ২৩ জুন ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি দলটির সহ সভাপতির দায়িত্ব পান। তিনি একাধিকবার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের সদস্য হিসেবে মহান ভাষা আন্দোলনে অন্যতম নেতৃত্ব দেন। ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে গেলে ১৯৫৫ সালে পূর্ববঙ্গ পরিষদের ভোটে গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। এছাড়া, গণপরিষদে বিরোধী দলের উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলে আতাউর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৬২ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে ‘ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট’ গঠন করেন। এই ফ্রন্ট আইউব বিরোধী আন্দোলনে যুগপথ ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করে। আতাউর রহমান খান আওয়ামী লীগ ছেড়ে ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই জাতীয় লীগ গঠন করেন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ঢাকা-৩ আসন থেকে নির্বাচন করে পরাজিত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে আটক হন এবং সেপ্টেম্বরে মুক্ত হন। ১৯৭৩ সালের প্রথম সংসদ নির্বাচনে আতাউর রহমান খানের বাংলা লীগ মাত্র ১টি আসন পায় ঢাকার ধামরাই (ঢাকা-১৯) থেকে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠন করলে তিনি ঐ দলে যোগ দেন। ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আতাউর রহমান জাতীয় লীগ সংগঠিত করেন। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ঢাকা-২১ আসন থেকে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসলে তিনি সাতদলীয় জোটের অন্যতম নেতা হিসেবে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। তবে ১৯৮৪ সালের ৩০ মার্চ হঠাৎ এরশাদের সামরিক শাসনামলে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলে ফের আলোচিত হন। ১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত মাত্র ১০ মাস প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন আতাউর রহমান খান।

সূত্র : মিজানুর রহমান চৌধুরী, রাজনীতির তিনকাল, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ৪০।

প্রধানমন্ত্রীত্বের নয় মাস, আতাউর রহমান খান, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০০।

আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৯০৫-১৯৭১, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ২২৭-২২৯।

২৫. শাহ আজিজুর রহমান (১৯২৫-১৯৮৮) : জন্ম কুষ্টিয়ায়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের এই নেতা। তবে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্বশাসনের বিরোধী ছিলেন। ১৯৭১ এ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করেন। এমনকি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে কোন গণহত্যা চালায়নি বলে ১৯৭১ সালের নভেম্বরে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে জাতিসংঘে বক্তব্য দেন। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিতে মুসলিম দেশগুলোকেও তিনি অনুরোধ জানান। ১৯৭৩ সালে সরকার শাহ আজিজকে মুক্তি দেন। ১৯৭৮ সালে জাতীয়তাবাদি ফ্রন্ট গঠিত হলে তিনি মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীদের নিয়ে এই দলে যোগ দেন। জাতীয়তাবাদি ফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন। পরে জাতীয়তাবাদি ফ্রন্টসহ অন্যান্য দল মিলে বিএনপি গঠিত হলে তিনি ঐ দলে যোগ দেন । ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে শাহ আজিজ কুষ্টিয়া থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে এমপি নির্বাচিত হন এবং ১৫ এপ্রিল জিয়াউর রহমান তাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। ১৯৮১ সালের ২১ মে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর এরশাদ তাকে প্রধানমন্ত্রীচ্যুত করেন।

সূত্র : বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ড. আবুল ফজল হক, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ১৭২-১৭৫।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, তারিক হোসেন খান, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ২৪৫-২৫১।

২৬. মিজানুর রহমান চৌধুরী (১৯২৮-২০০৬) : ছাত্রজীবন থেকেই প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন; চিলেন প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র আন্দোলনেও। ১৯৬২ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হন। ১৯৬৯ এ বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকায় আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মিজানুর রহমান। পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনে সক্রিয় এই নেতা ৭০ এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হন। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এই নেতা ১৯৭৩ সালের প্রথম সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুর থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হন। একই বছর বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করলে মিজান চৌধুরী তথ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পান। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন ধরলে তিনি দলটির মিজান অংশের নেতৃত্ব দেন। অপর অংশের নেতৃত্বে ছিলেন সাবেক স্পিকার মালেক উকিল। ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে তার দল আওয়ামী লীগ (মিজান) মই প্রতীকে ১৮৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন পায়। পরে তিনি ১৯৮৪ সালে এরশাদের দল জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৮৬ সালের ৯ জুলাই থেকে ১৯৮৮ সালের ২৭ মার্চ দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯১ সালে এরশাদ জেলে গেলে মিজান চৌধুরী জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সালে মিজান চৌধুরী আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং ২০০৬ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু দলটির উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য ছিলেন।

সূত্র : মিজানুর রহমান চৌধুরী, রাজনীতির তিনকাল, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১।

২৭. ফ্রিডম পার্টি : ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃসংশভাবে হত্যা করে একদল বিপথগামী সেনা অফিসার। এতে নেতৃত্ব দেন ফারুক, রশিদ, ডালিম, বজলুল হুদা, মহিউদ্দিন প্রমুখ। খুনীরা পরবর্তীতে ফ্রিডম পার্টি গঠন করেন। দলটি ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়। আর দেশের অন্যতম বড় রাজনৈতিক

দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ও জামায়াতে ইসলামী ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন বর্জন করলেও বিএনপির নেতৃত্বে একতরফা ঐ নির্বাচনে ফ্রিডম পার্টি অংশ নেয়। নির্বাচনে ফ্রিডম পার্টি ১টি আসন পায় আর বিরোধীদলীয় নেতা হন দলটির সভাপতি কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) ফারুক।

২৮. বৃত্ত ও বৃত্তান্ত বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় শাসন, রাজনীতি ও উন্নয়ন ভাবনা, তোফায়েল আহমেদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃষ্ঠা ৫৪।

২৯. সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ২৯ মার্চ ১৯৯০।

৩০. উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ২০০৯, চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের তথ্যাবলী, সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, সুশাসনের জন্য নাগরিক, সুজন, প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : তিন

নির্বাচনী আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন : প্রেক্ষিত নবম জাতীয় সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

৩.১ নির্বাচনী আইন ও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন :

একটি দেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় নির্বাচন খুবই তাৎপর্য বহন করে। এজন্য দেশের শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন পদ্ধতি গণতান্ত্রিক হওয়া জরুরি। নির্বাচন পদ্ধতি ও ব্যবস্থা নিরপেক্ষ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে সে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়। তাই নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে নির্বাচন পরিচালনাকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনকে অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নির্বাচনের ইতিহাসে ড. এ টি এম শামসুল হুদা কমিশন সেটি সাহসিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পেরেছিলো বলে নির্বাচন পরবর্তী দেশি-বিদেশি বিভিন্ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা, এনজিও এর রিপোর্ট এবং পত্র-পত্রিকার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধে জানা যায়। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে কাজটি করা সম্ভব হয়েছিলো সেনাবাহিনী নির্বাচন পরিচালনায় সহযোগিতা করায়। কারণ, ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও পেছনে ছিলো সেনাবাহিনী। নবম সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে মানুষ দেখেছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণরাখতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এই বাহিনীটি। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জরুরি অবস্থার মধ্যে নিয়োগ পাওয়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে আছে তাদের বেশ কিছু সময়োপযোগি ও কার্যকর নির্বাচনী উদ্যোগের কারণে। সেটি হলো : দায়িত্ব নিয়েই ড. শামসুল হুদা কমিশন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে বিদ্যমান নির্বাচনী আইন ও ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। পাশাপাশি নির্বাচনী আইনের সংস্কার, নির্বাচনী আচরণবিধি, রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন শর্ত ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে সংলাপ করেছে, তাদের মতামত ধৈর্যসহ শুনেছে; পরে সেই সব মতামত ও সুপারিশ যথাযথ উপায়ে সম্পাদনা করে নির্বাচনী আইনের সংস্কারে সন্নিবেশ করেছে। ফলে, সবার মতামতের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশন একটি গ্রহণযোগ্য ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনী আইন, কানুন ও বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয় নবম সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের আগে। আর নির্বাচনী যে সব আইনের সংস্কার হুদা কমিশন করতে পেরেছে, সেটি নবম সংসদ নির্বাচনে খুবই ভালোভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলো বিধায় নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণও দেশ-বিদেশে সবার কাছ গ্রহণযোগ্য হয়েছে। পক্ষান্তরে, রাজনৈতিক সরকারের (আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার) আমলে তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায়, সে ক্ষেত্রে নির্বাচনী আইনের সঠিক ও কঠোর প্রয়োগ করা সত্যিকার অর্থে সম্ভব হয় নাই। কারণ,

সরকারদলীয় রাজনৈতিক প্রভাব নির্বাচনে কাজ করেছে প্রার্থী ও সমর্থকদের আচরণে। তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারি প্রার্থীরা আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। যা হোক, আলোচ্য গবেষণায় কেস স্টাডি হিসেবে বেছে নিয়েছি নবম জাতীয় সংসদের ঢাকা-৬ নির্বাচনী আসন ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনকে। এই দুই নির্বাচনে মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী আইনের কতটা প্রয়োগ হয়েছে সে বিষয়ে কেস স্টাডির মাধ্যমে সম্যক ধারণা পাওয়া গেছে। এছাড়া, নির্বাচনী আইন মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি কি বাধা আছে সে বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে আলোচ্য গবেষণায়।

৩.২ ঢাকা-৬ সংসদীয় আসনের ইতিহাস ও নির্বাচন

ওয়ার্ড : নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ হওয়ায় রাজধানী ঢাকার আসন বেড়ে দাঁড়ায় ২০টি তে। সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ঢাকা-৬ আসনের অবস্থান **১৭৯** নম্বরে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের **১১**টি ওয়ার্ড নিয়ে এই সংসদীয় আসন। ওয়ার্ডগুলো হলোঃ ৭০, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১ ও ৮২ নম্বর ওয়ার্ড।

থানা : ৫টি থানা নিয়ে ঢাকা-৬ নির্বাচনী আসন। এগুলো হলো :

১. সূত্রাপুর

২. কোতয়ালী

৩. গেন্ডারিয়া

৪. বংশাল এবং

৫. ওয়ারি।

ভোট কেন্দ্র : ঢাকা-৬ আসনে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ৯৫।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা-৬ আসনে দেশের নামকরা কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। ব্রিটিশ আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে নির্মিত বাংলার প্রথম সরকারি স্কুল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল (১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত) সদরঘাট এলাকায় অবস্থিত। পগোস স্কুল, সেন্ট গ্রেগরি স্কুলও এই এলাকায় অবস্থিত। লক্ষী বাজারের সুভাস বসু অ্যাভিনিউয়ে **১৮৮২** সালে প্রতিষ্ঠিত সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমত্য সেন পড়ালেখা করেছেন। এখানে আছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (সাবেক জগন্নাথ কলেজ) ও কবি নজরুল কলেজ। এছাড়া, বাবু বাজারের মিডফোর্ড সড়কে প্রতিষ্ঠিত স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিডফোর্ট হাসপাতালটিও ঢাকা-৬ আসনের মধ্যে পড়েছে।

ভোটার : নবম সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনে ভোটার ছিলো ২ লাখ ২৪ হাজার ৮৯৯টি। নির্বাচনে বাতিল হয় ১০৩১টি ভোট, মোট প্রদত্ত ভোট ১ লাখ ৮৯ হাজার ৬১২ ভোট; বৈধ ভোট ১ লাখ ৮৮ হাজার ৫৮১টি। ভোটের শতকরা হার ৮৪.৩১ শতাংশ।

অবস্থান: রাজধানী ঢাকার প্রাণ বুড়িগঙ্গা নদীর কোল ঘেঁষে ঢাকা-৬ আসন। এটি মূলত: পুরনো ঢাকার আসন হিসেবে পরিচিত।

পেশা : এই এলাকার অধিকাংশ মানুষের পেশা মটর পার্টস ও কলকারখানার মেশিনারিজের ব্যবসা। বুড়িগঙ্গা নদীর কোল ঘেঁষে বিভিন্ন ধরনের শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠেছে বহু বছর ধরে। এ জন্য ঢাকার মধ্যে মেশিনারিজ ব্যবসায় একচেটিয়া দাপট ওল্ড টাউনে।

ভাষা : ঢাকা-৬ আসনের এলাকার মানুষের ভাষা অর্থাৎ ঢাকার আদি ভাষা 'ঢাকাইয়া'।

ইতিহাস : পাকিস্তানে করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ১৯৭৩ সালে। ঐ নির্বাচনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচন করেন। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চের ঢাকা-৬ আসনের নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন ৩ জন। আওয়ামী লীগের প্রার্থী শেখ মুজিবুর রহমান, ন্যাপ নেতা কাজী জাফর আহমেদ এবং জাসদের এম এ আউয়াল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ১ লাখ ১৪ হাজার ৯২৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জাসদের এম এ আউয়াল। তিনি পান ১৭ হাজার ১৪৫ ভোট। আর তৃতীয় হন ন্যাপের কাজী জাফর আহমেদ।

দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। ঐ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনে প্রার্থী ছিলেন ১৩ জন। তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় বিএনপির প্রার্থী জাহাঙ্গীর মো. আদেল ও আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ হানিফের মধ্যে। আদেলের কাছে হেরে যান হানিফ। আদেল পান ৫৪ হাজার ৮ ভোট আর হানিফ ৪০ হাজার ৪২১ ভোট।

তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনে মোট ১১ জন অংশ নিলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও জাতীয় পার্টির প্রার্থী জাহাঙ্গীর মো. আদেলের মধ্যে। যদিও আদেল ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী ছিলেন, পরে জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় আসলে তিনি বিএনপি ছেড়ে জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন। তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫২ হাজার ৬৩৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন আদেল। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ হাসিনা পান ৪১ হাজার ২০০ ভোট।

১৯৯১ সালের পঞ্চম সংসদ নির্বাচনেও পুরনো ঢাকার এই আসন (ঢাকা-৬) থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। নির্বাচনে তিনি ঢাকার সাবেক মেয়র ও বিএনপিদলীয় প্রার্থী সাদেক হোসেন খোকার কাছে হেরে যান ২৭ হাজার ২৩৯ ভোটের ব্যবধানে। সাদেক হোসেন খোকা পান ৭৬ হাজার ৬০১ ভোট আর শেখ হাসিনা পান ৪৯ হাজার ৩৬২ ভোট। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে পরাজিত

করার পুরস্কার হিসেবে সাদেক হোসেন খোকাকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন ২৪ জন। ৮৭ হাজার ২৫৫ ভোট পেয়ে ঢাকা-৬ আসন থেকে বিজয়ী হন সাদেক হোসেন খোকা। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের ফজলুল করিম পান ৮৪ হাজার ৯৪০ ভোট। অন্যদিকে, লাঙ্গল প্রতীকে জাতীয় পার্টির প্রার্থী জাহাঙ্গীর মো. আদেল পান ১৩ হাজার ২৮৭ ভোট।

২০০১ সালে অষ্টম সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনে বিএনপি'র প্রার্থী সাদেক হোসেন খোকা ১ লাখ ২৩ হাজার ৬৮৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগের সাঈদ খোকন। তিনি পান ৯৮ হাজার ২২৯ ভোট। আর জাতীয় পার্টির জাহাঙ্গীর মো. আদেল পান ৩ হাজার ৯৩ ভোট।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নবম সংসদ নির্বাচনে এই আসনটি ছিলো হেভিওয়েট প্রার্থীদের দখলে। বিকল্পধারা বাংলাদেশের সভাপতি অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তার জাতীয়তাবাদি রাজনীতির দীর্ঘদিনের সহকর্মী সাদেক হোসেন খোকা ও আওয়ামী লীগের তরুন প্রার্থী মিজানুর রহমান খান দিপুর সঙ্গে। সবাইকে চমকে দিয়ে দিপু ১ লাখ ৩ হাজার ৭৩৭ ভোট পেয়ে এমপি নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাদেক হোসেন খোকা পান ৭২ হাজার ৪৫৪ ভোট। আর অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী পান ৫ হাজার ২১৫ ভোট। মিজানুর রহমান খান দিপু ৪৪ বছর বয়সে এমপি নির্বাচিত হন। তিনি মূলত: ব্যবসায়ী ও ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন। মিজানুর রহমান খান দিপু ২০১৩ সালের ২১ ডিসেম্বর ভোরে মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ জনিত কারণে রাজধানীর অ্যাপোলো হাসপাতালে মারা যান।

সারণি : ২৫

ঢাকা-৬ আসনের প্রার্থী, রাজনৈতিক দল ও প্রতীক:

প্রার্থীর নাম	**দল**	**প্রতীক**
ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	কুলা
আহসান আতিক	তরিকত ফেডারেশন	ফুলের মালা
মিজানুর রহমান খান (দিপু)	আওয়ামী লীগ	নৌকা
শমসের আলী তালুকদার	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা
সাদেক হোসেন খোকা	জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি	ধানের শীষ
হাজী মো. মনোয়ার খান	ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন	হাতপাখা

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সাদেক হোসেন খোকা :

১৯৫২ সালের ১২ মে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। গোপীবাগের বাসিন্দা সাদেক হোসেন খোকা ১৯৭১ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তিনি ২০০২ সালের ২৫ এপ্রিল ঢাকার মেয়র নির্বাচিত হন। এছাড়া, ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনে বিএনপিদলীয় প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হন। ২০০১ সালে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী হলে মেয়র পদ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে ২০০৪ সালে পদত্যাগ করেন। হলফনামায় পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন ব্যবসাকে। সাদেক হোসেন খোকার বিরুদ্ধে অসংখ্য ফৌজদারি মামলা রয়েছে। আয়ের উৎস শেয়ার, সঞ্চয়পত্র, ব্যাংক আমানত, বাড়ি ভাড়া, অ্যাপার্টমেন্ট, দোকান ভাড়া ও অন্যান্য। আমানত ২৫ লাখ টাকা। নিজ নামে সম্পদ নগদ ৪২,৬৩,৭৬৮ টাকা। ব্যাংকে ৩২,২৭,৬৩২ টাকা; শেয়ার আছে ১৮,৭৫০০০ টাকার। পোস্টাল ৩,৭৯,৭৮৯ টাকা। মোটর গাড়ির দাম ৪১,০৬০০০ টাকা, স্বর্ণ ১ লাখ টাকার এবং আসবাবপত্র ৫০ হাজার টাকার। অন্যান্য খাতের ২ লাখ ৩৬ হাজার ৪৬৩ টাকা। মূলধন দেখিয়েছেন ২০ লাখ ৩৪ হাজার। অকৃষি সম্পত্তি ১ কোটি ৬০ লাখ টাকার এবং কৃষি জমি ৮৪ লাখ ৩৩ হাজার টাকার। বিনিয়োগ ২৯ লাখ ৭৯ হাজার ৭৮৯ টাকা। মোটরযান ৪১ লাখ ৬ হাজার টাকা। অলংকার ১ লাখ টাকার। আসবাবপত্র ৫০ হাজার টাকা। নগদ ৪২ লাখ ৬৩ হাজার ৭৬৮ টাকা। ব্যাংকে ৩২ লাখ ২৭ হাজার ৬৩২ টাকা। স্ত্রীর নামে নগদ ৬৮,০০৫১৯ টাকা। ব্যাংকে ১৪,২৬,১৩৫ টাকা। শেয়ার ৬,২৫,০০০ টাকা। পোস্টাল : ৩,৭৮,৭৭৬ টাকা। গাড়ির দাম ১২,২০,০০০ টাকা। স্বর্ণ ১,৫০.০০০ টাকা। আসবাবপত্র ৩০,০০০ টাকার।

সূত্র : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী:

অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী পেশায় একজন চিকিৎসক ও রাজনীতিবিদ। ১৯৩২ সালের ১ নভেম্বর মুন্সীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা অ্যাডভোকেট কফিলউদ্দিন চৌধুরী অবিভক্ত ভারতে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী ছিলেন। বদরুদ্দোজা চৌধুরী ছিলেন বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব। ১৯৭৯ সালে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন মুন্সিগঞ্জ-১ আসন থেকে। তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কেবিনেটে উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আর ১৯৭৯ থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত ছিলেন বিএনপি'র মহাসচিব। ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি ক্ষমতায় গেলে বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রী ও পরে সংসদ উপনেতার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে বিএনপি ক্ষমতায় যেতে ব্যর্থ হলে তিনি সংসদে বিরোধী দলের উপনেতা ও ২০০১ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন; আর ২০০১ সালের নভেম্বরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। বি. চৌধুরী বিএনপি থেকে ১৯৭৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৬ (১৫ ফেব্রুয়ারি) ও ২০০১ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এক

সংকটময় সময়ে দলের মধ্যে তার প্রতি অনাস্থা তৈরী হলে বিএনপি'র চাপে ২০০২ সালের ২১ জুন রাষ্ট্রপতি থেকে পদত্যাগ করেন। পরে ২০04 সালের ১১ মার্চ বিকল্পধারা বাংলাদেশ নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। বিএনপি থেকে বেশ কিছু কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক মন্ত্রী ও এমপি বিকল্পধারায় যোগ দেন। সবশেষ, ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। নির্বাচন কমিশনের হলফনামায় তার পেশা হিসেবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উল্লেখ আছে। তিনি বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা ও ৯৭ লাখ, ৩০ হাজার ৬৪৭ টাকা। ঋণ আছে ২৯ লাখ টাকা। তার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা নেই।

সূত্র : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

মিজানুর রহমান খান দিপু :

নবম সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য প্রয়াত মিজানুর রহমান খান দিপু। তার বাবা ছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা মরহুম নজরুল ইসলাম ওরফে বাদল খান এবং মা মরহুমা হাসনা ইসলাম খান। দিপু দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এন জেড কর্পোরেশন লিমিটেড সাউথ এশিয়া শিপিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। মিজানুর রহমান শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। নির্বাচনী হলফনামায় বার্ষিক আয় দেখিয়েছিলেন পৌনে ৮ লাখ টাকা। আয়ের উৎস হিসেবে দেখিয়েছেন ব্যবসায় ৫ লাখ ৪৬ হাজার টাকা, আর বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, দোকান ও অন্যান্য খাতে ২ লাখ ৪৩ হাজার ৫৪০ টাকা। কোন ফৌজদারি মামলা ছিলোনা তার বিরুদ্ধে । ১৯৬৪ সালের জন্মগ্রহণ করা মিজানুর রহমান খান দিপুর বাড়ি সূত্রাপুর থানার কাঠের পুলে, তবে পৌত্রিক বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার মৌচ্ছামান্ডা গ্রামে। তিনি ছিলেন প্রযোজক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক। এছাড়া, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বিশাল শিপিং লাইনসের চেয়ারম্যান, ঢাকা মহানগর ক্লাব সমিতির সভাপতি ছাড়াও ব্রাদার্স ইউনিয়নের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সূত্র : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

সারণি : ২৬

ঢাকা-৬ নির্বাচনী আসনের ভোটের ফলাফল :

ঢাকা-৬	প্রতিদ্বন্দ্বী	দল	প্রতীক	প্রাপ্ত ভোট	ভোটের হার
ঢাকা-৬	মরহুম মিজানুর রহমান খান	আওয়ামী লীগ	নৌকা	১০৩৭৩৭	৫৫.০১
ঢাকা-৬	সাদেক হোসেন খোকা	বিএনপি	ধানের শীষ	৭২৪৫৪	৩৮.৪২
ঢাকা-৬	বদরুদ্দোজা চৌধুরী	বিকল্পধারা	কুলা	৫২১৫	২.৭৭
ঢাকা-৬	হাজী মো. মনোয়ার খান	ইসলামী আন্দোলন	হাতপাখা	২১৭৫	১.১৫
ঢাকা-৬	শমসের আলী তালুকদার	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা	৩৮১	০.২০
ঢাকা-৬	এম আহসান আতিক	তরিকত ফেডারেশন	ফুলের মালা	২৩৫	০.১২
ঢাকা-৬	উপরের কাউকেও না		না ভোট	৪৩৮৪	২.৩২

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

৩.৩ কেস স্টাডি : ঢাকা-৬ নির্বাচনী আসন

প্রেক্ষাপট : ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম সংসদের ঢাকা-৬ আসনের নির্বাচন।

নির্বাচনী আচরণবিধি ও বাস্তবায়ন :

নবম সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনের ছয়জন প্রার্থীর মধ্যে ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথম তিনজনের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে। এই আসনে আওয়ামী লীগের বিজয়ী প্রার্থী মিজানুর রহমান খান দিপু তার জীবদ্দশায় দেয়া সাক্ষাতকারে বলেছেন, নির্বাচনে প্রার্থীরা আচরণবিধি লঙ্ঘন করেননি। অন্যদিকে, বিএনপি দলীয় পরাজিত প্রার্থী সাদেক হোসেন খোকার দাবি কিছু জায়গায় প্রার্থীরা আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছিলেন। আর নির্বাচনে তৃতীয় স্থান লাভ করা বিকল্পধারার প্রার্থী ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বক্তব্য হলো- প্রার্থীরা মোটামুটিভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। তার অভিযোগ, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রাথী ইচ্ছেমতো পোলিং সেন্টারে ঢুকেছে ও বের হয়েছে। এদিকে, নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারি রিটার্নিং অফিসার আজিজ হাসান জানিয়েছেন যে, আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি। আর তিনজন সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার জানিয়েছেন নির্বাচনে প্রার্থীরা আচরণবিধি লঙ্ঘন করেন নাই। এদিকে, জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ জানিয়েছেন, যেহেতু জরুরি অবস্থা

জারির পর সেনাবাহিনী সারা দেশে মোতায়েন ছিলো তাই নির্বাচনে প্রার্থীদের দ্বারা আচরণবিধি লঙ্ঘনের তেমন কোন ঘটনা দেখা যায়নি। সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা জানিয়েছেন, আগে যখন সংসদ নির্বাচন হতো তখন সবাই ফ্রি স্টাইলে আচরণবিধি লঙ্ঘন করতো; আইন ও আইনের কঠোর প্রয়োগ না থাকায় প্রার্থীরা পার পেয়ে যেতো। ২০০৮ সালে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। সবাই জানতো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পেছনে সেনাবাহিনী ছিলো; নির্বাচন কমিশনও কঠোর থাকায় আইনও ফোকাসড ছিলো। শামসুল হুদার মতে, ঢাকা-৬ এর নির্বাচনে আচরণবিধি খুব একটা লঙ্ঘিত হয়নি। সাবেক নির্বাচন কমিশনার ছহুল হোসাইনের মতে, প্রার্থীরা আচরণবিধি মেনেই প্রচার করেছিলো। এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সাবেক সচিব মো. হুমায়ুন কবিরের বক্তব্য হলো-প্রার্থীরা আচরণবিধি মেনেই প্রচার চালিয়েছিলেন। নির্বাচনের সংবাদ কাভার করা দৈনিক যুগান্তরের সাবেক বিশেষ প্রতিনিধি ও বর্তমানে আলোকিত বাংলাদেশের চিফ রিপোর্টার হোসাইন জাকিরের বক্তব্য-প্রার্থীরা নির্বাচনী আচরণবিধি মেনেছেন। ভোটের সময় কোন আচরণবিধি লঙ্ঘনের খবর পান নাই বলে জানিয়েছেন সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার আফরোজা সুলতানা ও আব্দুল ওয়াদুদ। আর ঢাকা-৬ আসনের ভোটার ফারুখ আহমেদ জানিয়েছেন, তার জানা মতে, প্রার্থীরা বড় রকমের আচরণবিধি লঙ্ঘন করেন নাই।

নবম সংসদে ঢাকা-৬ আসনের নির্বাচনী মূল্যায়ন :

ঢাকা-৬ আসনের নির্বাচন শান্তিপূর্ণহয়েছিলো বলে দাবি করেছিলেন আওয়ামী লীগের বিজয়ী প্রার্থী মিজানুর রহমান খান দিপু। নির্বাচন শান্তিপূর্ণহয়েছিলো এর প্রমাণ বিপুল ভোটে নবীনতম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন–এমন দাবি তার। আর জনগণ নতুন নেতৃত্ব দেখতে চেয়েছে বলেই অন্যান্য হেভিওয়েট প্রার্থীর তুলনায় তাকে ভোটাররা বেছে নিয়েছিলেন বলে দিপু তার জীবদ্দশায় কেস স্টাডির সাক্ষাতকারে দাবি করেছিলেন। এদিকে, বিএনপি দলীয় প্রার্থী সাদেক হোসেন খোকা দাবি করেছেন, নির্বাচনে সুক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে; তা না হলে একজন নতুন প্রার্থী কিভাবে এত বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়। এদিকে, বিকল্পধারার প্রার্থী ড. বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, তার কাছে মনে হয়েছে নির্বাচন কমিশন বা সরকার সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। তার দাবি, অনেক জায়গায় পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়া হয়েছে।

ঢাকা-৬ আসনের নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আজিজ হাসান। তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়নি এই মর্মে লিখিতভাবে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। এ প্রসঙ্গে সাবেক সিইসি ড. এ টি এম শামসুল হুদা জানিয়েছেন, নির্বাচন সার্বিকভাবে সুষ্ঠু হয়েছে। এমনকি পরাজিত প্রার্থী ও এজেন্টরাও লিখিত অভিযোগ দেননি। সাবেক নির্বাচন কমিশনার ছহুল হোসাইন বলেছেন, ঢাকা-৬ এর নির্বাচন খুবই শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও নিরপেক্ষ দাবি করে তিনি

বলেন, এটি ছিলো আদর্শ নির্বাচন। নির্বাচন কমিশনের সাবেক সচিব হুমায়ুন কবিরও বলেছেন, নির্বাচন খুবই ভালো ও শান্তিপূর্ণহয়েছিলো। অন্যদিকে, জানিপপের প্রধান নির্বাচনী পর্যবেক্ষক প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ বলেছেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছিলো। ইসির সাবেক যুগ্ম সচিব বিশ্বাস লুৎফর রহমানের মতে-নির্বাচন শতভাগ সফল হয়েছে। সূত্রাপুর থানার নির্বাচনী কর্মকর্তা মো. রশিদ মিয়া বলেন, এক কথায় নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণহয়েছে। আর দৈনিক যুগান্তরের সাবেক বিশেষ প্রতিনিধি ও বর্তমানে আলোকিত বাংলাদেশের চিফ রিপোর্টার হোসাইন জাকির বলেছেন, অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে। এদিকে, ঢাকা-৬ আসনে সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারি আফরোজা সুলতানা ও আব্দুল ওয়াদুদ বলেছেন, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে। আর ভোটার ফারুখ আহমেদের মতে, নব মিলিয়ে শান্তিপূর্ণনির্বাচন হয়েছে।

নির্বাচনের আগে ও পরে সহিংসতা :

মিজানুর রহমান খান দিপু বলেছিলেন, ঢাকা-৬ আসনে নির্বাচন খুবই শান্তিপূর্ণহয়েছে। তাই এখানে ভোটের আগে ও পরে কোন সহিংসতা হয় নাই। আর বিএনপি'র পরাজিত প্রার্থী সাদেক হোসেন খোকা মনে করেন, নির্বাচনে কোন সহিংসতা হয়নি। তবে, বিকল্পধারার প্রার্থী বদরুদ্দোজা চৌধুরীর দাবি নির্বাচনে বেশি নয় অল্প পরিমাণে সহিংসতা হয়েছে। যেমন : চড়, কিল, ঘুষি মারা হয়েছে প্রার্থীর সমর্থকদের। এদিকে সাবেক সিইসি ড. শামসুল হুদার মতে, অন্য জায়গায় হলেও হতে পারে কিন্তু ঢাকা-৬ আসনে ভোটের আগে ও পরে সহিংসতা হয়নি। তার কথায় সুর মিলিয়ে সাবেক নির্বাচন কমিশনার ছহুল হোসাইন বলেছেন–নির্বাচনের আগে-পরে সংঘাতের খবর কমিশনে আসেনি। এদিকে, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ বলেছেন, সারাদেশে সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকায় সবাই সতর্ক থাকায় ভোটের আগে সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি। আর ইসি'র সাবেক যুগ্ম সচিব বিশ্বাস লুৎফর রহমান জানিয়েছেন, নির্বাচনে কোন সহিংসতা হয়নি; এমনকি নিরাপত্তা ছাড়াই কেন্দ্র থেকে ব্যালট বাক্স রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে আনা হয়েছে। এদিকে, দৈনিক যুগান্তরের সাবেক বিশেষ প্রতিনিধি ও বর্তমানে আলোকিত বাংলাদেশের চিফ রিপোর্টার হোসাইন জাকির জানিয়েছেন, কিছু বিক্ষিপ্ত ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ছাড়া ঢাকা-৬ আসনে বড় ধরনের সহিংসতা হয়নি। অন্যদিকে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোট কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা দলীয় প্রার্থীকে ভোট দিতে ভোটারদের চাপ দিয়েছে বলেও জানান ফারুখ আহমেদ।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের দিন পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব পালন :

ঢাকা-৬ আসনের প্রয়াত এমপি মিজানুর রহমান খান দিপু বলেছিলেন, নির্বাচনের দিন তার পোলিং এজেন্টরা শান্তিপূর্ণদায়িত্ব পালন করছিলেন। তবে পরাজিত প্রার্থী সাদেক হোসেন খোকা অভিযোগ করেছেন, আওয়ামী লীগের কিছু লোকজন তার এজেন্টদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দিয়েছিলো। আর বিকল্পধারার প্রার্থী ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বক্তব্য–প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর লোকজন তার এজেন্টদের হুমকি দিয়েছিলো। এ বিষয়ে নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালনকারি আজিজ হাসান (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব) বলেছেন, পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব পালনে কোনো প্রতিবন্ধকতার কথা কেউ তাকে জানায়নি। সাবেক সিইসি ড. শামসুল হুদা বলেছেন, পোলিং এজেন্টরা ভয়-ভীতি ছাড়াই দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন বলে তার ধারণা। অন্যদিকে, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ছহুল হোসাইন বলেন, পোলিং এজেন্টরা শান্তিপূর্ণদায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন। নির্বাচন শান্তিপূর্ণসম্পন্ন হয়েছে, সেখানে কোন প্রার্থীর এজেন্টকে ভয় দেখানো হয়নি জানিয়েছেন সাবেক কমিশন সচিব হুমায়ুন কবির। এদিকে, জানিপপ-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ'র মতে, পোলিং এজেন্টরা ভয়-ভীতি ছাড়াই দায়িত্ব পালন করেছেন। নির্বাচন কমিশনের সাবেক যুগ্ম সচিব বিশ্বাস লুৎফর রহমান জানিয়েছেন হুমকি ছাড়াই পোলিং এজেন্টরা দায়িত্ব পালন করেছেন। আর যুগান্তরের সাবেক বিশেষ প্রতিনিধি ও বর্তমানে আলোকিত বাংলাদেশের চিফ রিপোর্টার হোসাইন জাকির জানিয়েছেন, ভয়-ভীতি ছাড়াই পোলিং এজেন্টরা দায়িত্ব পালন করেছেন। এদিকে, সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার আফরোজা সুলতানা ও আব্দুল ওয়াদুদ জানিয়েছেন, প্রার্থীর এজেন্টদের কাছ থেকে হুমকির কোন অভিযোগ পাননি।

নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব পালনকালে ইসি'র নির্দেশনা :

ঢাকা-৬ আসনে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আজিজ হাসান। নির্বাচনে কোন প্রার্থীর পক্ষে কাজ করতে ইসির বা সরকারের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশনা পাননি বলে জানান। আর সাবেক নির্বাচন কমিশন সচিব হুমায়ুন কবির জানান, তাদের কেউ কোন নির্দেশ দেননি বরং তারা খুবই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছিলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার, কমিশনার বা কমিশনের অন্য কারো সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে কোন যোগাযোগ বা ফোন পর্যন্ত করেনি কেউ। এদিকে, নির্বাচন কমিশনের সাবেক যুগ্ম সচিব বিশ্বাস লুৎফর রহমান বলেন, নির্দেশ তো দূরের কথা নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার বা কোন বিশেষ মহল থেকে তাদের টেলিফোন পর্যন্ত করেনি। যুগান্তরের সাবেক বিশেষ প্রতিনিধি ও বর্তমানে আলোকিত বাংলাদেশের চিফ রিপোর্টার হোসাইন জাকির জানিয়েছেন, তিনি এমন কোন কিছু দেখেন নাই বা তার কাছে এমন তথ্য আসে নাই। এদিকে, সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার আফরোজা সুলতানা ও আব্দুল ওয়াদুদ সহকারি বলেছেন, ভোটের দিন কোন প্রার্থীর পক্ষে কাজ করতে কমিশন বা সরকারের প্রভাবশালীদের পক্ষ থেকে কেউ তাদের নির্দেশনা দেননি।

নির্বাচনে কালো টাকা ও পেশি শক্তির ব্যবহার :

সাবেক সিইসি এ টি এম ড. শামসুল হুদা জানান, ভোটের আগে কালো টাকার বিনিময়ে ভোট কেনা বেচা হয় এই কথা তিনি বহুবার শুনেছেন, কিন্তু এটি থামানো যায়না। শুধু বাংলাদেশেই না, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে টাকা দিয়ে ভোট কেনা-বেঁচা হয়। ড. শামসুল হুদা বলেন, কমিশন চেষ্টা করেছিলো হলফনামায় ৮টি তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক করতে, যাতে করে প্রার্থী নিয়মিত কর দেয় কিনা তা যেন জানা যায়। বিল ও ঋণ খেলাপিরা যেন নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন সেজন্য আইন করা হয়েছে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের প্রভাব আর অর্থের দাপট এতো বেশি যে, নির্বাচন কমিশন কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলের পরও তিনি উচ্চ আদালতের আশ্রয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেন। এমন অসংখ্য উদাহরণ নির্বাচনের আগে ঘটে বলেও জানান ড. শামসুল হুদা।

এদিকে, ঢাকা-৬ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিজয়ী প্রার্থী মিজানুর রহমান খান দিপু বেঁচে থাকাকালীন এই গবেষণার কেস স্টাডির সাক্ষাতকারে দাবি করেছিলেন, নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার করেননি। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ব্যয় সীমা অর্থাৎ ১৫ লাখ টাকার মধ্যে নির্বাচনী প্রচার কাজে খরচ করেছেন বলে দাবি করেছেন। মিজানুর রহমান খান দাবি করেছিলেন–আইন মেনেই নির্বাচনে খরচ করেছিলেন। এ বিষয়ে বিএনপি দলীয় প্রার্থী সাদেক হোসেন খোকা বলেন, নির্বাচনী ব্যয় সীমার (সর্বোচ্চ ১৫ লাখ টাকা) মধ্যেই অর্থ খরচ করেছেন। এদিকে, বিকল্পধারার প্রার্থী বি. চৌধুরী জানান, তিনি পেশি শক্তি ব্যবহার করেন নি সেটা হলফ করে বলতে পারবেন, তবে অন্য কোন প্রার্থী গোপনে পেশি শক্তির ব্যবহার করেছে কিনা বা কাউকে ভয়-ভীতি দেখিয়েছে কিনা সেটি তিনি বলতে পারবেন না। নির্বাচনে সর্বোচ্চ সীমা ১৫ লাখ টাকার মধ্যেই খরচ করেছন বলে দাবি সাবেক এই রাষ্ট্রপতির।

নির্বাচনকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর হুমকি :

নির্বাচনের আগে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষ থেকে মিজানুর রহমান খান দিপু ও তার পরিবারকে বিক্ষিপ্ত কিছু হুমকি দেয়া হলেও সেটি আমলে নেননি। আর বিএনপি দলীয় প্রার্থী সাদেক হোসেন খোকাকে কেউ হুমকি দেননি বলে জানান তিনি। এছাড়া, বিকল্পধারার প্রার্থী বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে কোন প্রার্থী হুমকি দেয়নি বলে তিনি জানান। তবে অভিযোগ, তার দলের লোকদের ঢাকা-৬ আসনের নির্বাচিত এমপি নানাভাবে ভয়-ভীতি দিয়েছেন। ঐ এলাকার থানা বিকল্পধারার সেক্রেটারির বিরুদ্ধে ২টি মামলা দেয়ার পাশাপাশি তাকে ভয়-ভীতি দেখানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন সাবেক এই রাষ্ট্রপতি।

নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতা :

ঢাকা-৬ আসনে নির্বাচনী কর্মকর্তারা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন বলে জানিয়েছিলেন মিজানুর রহমান খান দিপু। একই মত সাদেক হোসেন খোকার। তবে, অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, নির্বাচনী কর্মকর্তারা নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, সত্যিকার অর্থে সেই ক্ষমতা তাদের ছিলোনা; যতটুকু ছিলো তার সবটুকু প্রয়োগ করতে পারেননি। এদিকে সাবেক সিইসি শামসুল হুদার দাবি, ইসি'র কর্মকর্তারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। তার মতে, নির্বাচনী কর্মকর্তারা ঐ অর্থে খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না; কারণ তারা উপজেলা বা জেলা লেভেলে দায়িত্ব পালন করেন। আর কর্মকর্তারা নির্বাচন কমিশনের প্রতি অনেক বেশি দায়বদ্ধ থাকেন। আর সাবেক নির্বাচন কমিশনার ছহুল হোসাইন বলেছেন, ইসির কর্মকর্তারা নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কারো বিরুদ্ধে ই অনিয়ম বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পাওয়া যায় নাই। বরং নির্বাচনী কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালনে খুবই আন্তরিক ছিলেন।

নির্বাচন পূর্ব রাতে ভোট কেনা-বেচা প্রসঙ্গে :

এ বিষয়ে সাবেক সিইসি ড. এ টি এম শামসুল হুদা মনে বলেন, ভোটের আগে কালো টাকার বিনিময়ে ভোট কেনা বেচা হয় বহুবার শুনেছেন এই কথা। কিন্তু এটি থামানো যায়না। শুধু বাংলাদেশে নয় ভারত, পাকিস্তানে ভোট টাকা দিয়ে কেনা বেঁচা হয়। এটি দূর করতে সবার সহযোগিতা দরকার বলে মন্তব্য সাবেক এই প্রধান নির্বাচন কমিশনারের।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও নারী ভোটারদের মনস্তাত্বিক চাপ প্রয়োগ :

সাবেক সিইসি শামসুল হুদা বলেন, নবম সংসদ নির্বাচনের সময় হিন্দু বা অন্য কোন ধর্মের অনুসারি ভোটারদের উপর হামলা কিংবা নারী ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেয়ার মতো ঘটনা তেমন একটা চোখে পড়েনি। তার মতে, যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২ বছর ক্ষমতায় ছিলো সেহেতু সবাই সেনাবাহিনীকে ভয় পেয়েছে। আর কিছু হামলার অভিযোগ পাওয়া গেলেও তদন্তে সেটি সঠিক পাওয়া যায়নি। এদিকে, এ বিষয়ে সাবেক নির্বাচন কমিশনার ছহুল হোসাইনের বক্তব্য হলো–সংখ্যালঘুদের উপর হামলা বা নির্যাতনের কোন খবর তাদের কাছে আসেনি।

৩.৪ সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার ইতিহাস ও নির্বাচন :

উপজেলা নির্বাচনের ওপর সমীক্ষার জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলাকে বাছাই করা হয়েছে। কারণ, নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে সিরাজগঞ্জ-৫ আসনে নবম সংসদে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাসসহ বেশ ক'জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি করেন সিরাজগঞ্জের সাবেক জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা নীতিশ চন্দ্র দে। অন্যদিকে নির্বাচনকে প্রভাবিত করা, কেন্দ্রের রিপোর্ট ছিনতাই, পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও নির্বাচনী কর্মকর্তাকে মারধরের অভিযোগে বেলকুচি উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী ও বেলকুচি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হামিদ আকন্দসহ বেশ ক'জনের বিরুদ্ধে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আরেকটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন ঐ সময় বেলকুচি থানার নির্বাচনী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন। মামলা করার পর মন্ত্রীর লোকজন তাকে নানাভাবে হুমকি দেয়। সহিংসতা আর অনিয়মে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন স্থগিত হলে ৬ এপ্রিল ঐ উপজেলায় আবারো নির্বাচন হয়। বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী ছিলেন ৪ জন। এরা হলেন : মো. আলী আলম (২২ জানুয়ারি নির্বাচন স্থগিত হলে ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন), ফজলুল হক সরকার, ইমদাদুল হক এমদাদ এবং মফিজউদ্দিন খান লাল। ফজলুল হক সরকার ছিলেন মৎস ও পশুসম্পদ মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাসের আস্থাভাজন ও বেলকুচি থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম হয়। ব্যালট বাক্স ছিনতাই, পোলিং এজেন্টদের মারধর করে বের করে দেয় আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সমর্থক ও স্থানীয় মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাসের লোকজন। ঐদিন নির্বাচন কমিশন ঢাকা অফিস থেকে বেলকুচি নির্বাচন স্থগিত করে। বেলা পৌনে তিনটার দিকে ৮১টি ভোটকেন্দ্রের ৭০টি কেন্দ্রের রিপোর্ট ও মালামাল গ্রহণের সময় বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন ও বেলকুচি উপজেলা শিক্ষা অফিসার তৌহিদুল ইসলামের উপর হামলা করে। এমনকি কেন্দ্রের রিপোর্টগুলো ছিনিয়ে নেয়। মোশাররফ হোসেন ২৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন যাতে প্রধান আসামী ছিলেন মেয়র পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী ফজলুল হক সরকার। এছাড়া, ভাঙ্গাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন প্রামাণিক ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুল আলী আকন্দকেও অন্যতম আসামী করা হয়। সহিংসতার কারণে ২২ জানুয়ারি দুপুরে নির্বাচন কমিশন বেলকুচির উপজেলা নির্বাচন স্থগিত হওয়ার পর ৬ এপ্রিল বেলকুচিতে পুন:নির্বাচন শান্তিপূর্ণঅনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মামলা খারিজ প্রসঙ্গে :

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন ও নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগে যাদের বিরুদ্ধে দু'টি মামলা দেয়া হয়েছিলো তারা সবাই সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলো; তাই মামলাটি বেশি দূর আগাতে পারেনি। এমনকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শুনানি পর্যন্ত হয়নি। প্রথম মামলার এক নম্বর ও দুই নম্বর আসামী ছিলেন একই ব্যক্তি (ফজলুল হক সরকার); বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন, মামলার আসামী হিসেবে তাকে, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী ও অন্যান্য আসামীদের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ডাকা হয়নি এবং তাদের বিরুদ্ধে শুনানিও করা হয়নি। মামলার ২টির বাদি নিতিশ চন্দ্র দে এবং মোশাররফ হোসেন স্বীকার করে বলেছেন–রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাস ও তার লোকজনের বিরুদ্ধে ভয়ে স্বাক্ষ্য দিতে যান নাই। ক'জন স্বাক্ষী মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিতে গিয়ে আদালতে বিব্রত হয়েছেন। ঐ অবস্থায় এক ধরনের অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েন মামলা দু'টির বাদিরা। একটি মামলার বাদি মোশাররফ হোসেন ভোলা জেলার তজুমদ্দিন উপজেলা থেকে সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে এসে মামলায় হাজিরা দিয়েছেন একাধিকবার। ভোলা থেকে সিরাজগঞ্জে এসে হাজিরা দেয়া তার জন্য কষ্টকর ছিলো। মামলার দুই বাদি পরে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে বলেন যে, অজ্ঞাত পরিচয়ের কিছু মানুষ তাদের উপর হামলা করেছিলো। তবে, তারা নিশ্চিত না হামলাকারিরা কারা ছিলেন। শুধু তাই নয়, মামলার তদন্তকারি পুলিশ কর্মকর্তা মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাস ও বেলকুচি উপজেলার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজিত প্রার্থী ফজলুল হক সরকারসহ অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে ভোটের দিন কোন নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, অনিয়ম ও নির্বাচনী সহিংসতা ঘটানোর প্রমাণ পাওয়া যায়নি-এই মর্মে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে। এ অবস্থায় মামলার বাদি মোশাররফ হোসেন আদালতে নারাজি দিয়ে মামলা প্রত্যাহার করে নেন।

এক নজরে বেলকুচি উপজেলা :

নামকরণ : মিস্টার বেলকুচি নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে এসেছিলেন চাষাবাদের জন্য। এটা প্রচলিত যে, ঐ ব্রিটিশের নামে বেলকুচি উপজেলা নামকরণ হয়েছে। এটি ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবস্থান : সিরাজগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ২৫কিলোমিটার দক্ষিণে বেলকুচি উপজেলা। উত্তরে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা, দক্ষিণে শাহজাদপুর ও চৌহালি উপজেলা, টাঙ্গাইলের কালিহাতি, টাঙ্গাইল সদর ও যমুনা নদী পূর্বে

এবং কামারখন্দ ও উল্লাপাড়া উপজেলা পশ্চিমে। এতে আছে ৬টি ইউনিয়ন। যমুনা আর হুরা সাগর প্রধান দুই নদী। ১০৮টি মৌজা আর ১৩২টি গ্রাম নিয়ে বেলকুচি উপজেলা গঠিত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : বেলকুচিতে রয়েছে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে কলেজ ৬টি, হাইস্কুল ১৫টি, জুনিয়র স্কুল ৮টি, মাদ্রাসা ২২টি এবং প্রাইমারি স্কুল ১২৯টি।

আয়তন : বেলকুচি উপজেলার আয়তন ১৬৪.৩১ স্কয়ার কিলোমিটার।

জনসংখ্যা : সবশেষ ২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৩ লাখ ৫২ হাজার ৮৩৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৭৯ হাজার ৭৩৮ জন। আর নারী ১ লাখ ৭৩ হাজার ৯৭ জন।

শিক্ষা : বেলকুচি উপজেলায় শিক্ষার হার ৩২.৪ শতাংশ। গড় শিক্ষার হার ৩২.৪ শতাংশ।

প্রধান অর্থকরি ফসল : পাট, ধান, শরিষা।

কাপড় : এই উপজেলার মানুষের তৈরী সুতি কাপড় এক সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো। তাই এখানকার উৎপাদিত কাপড় পৃথিবী বিখ্যাত; বিশেষ করে লুঙ্গি। এই উপজেলার জোলা সম্প্রদায় কাপড় তৈরীর সঙ্গে জড়িত।

ফল : আম, জাম, কাঠাল, লিচু, কালো জাম, পেঁপে, কলা, মিষ্টি আলু।

ফসল : শরিষা বিজ।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান : ক্লাব ৪২টি, পাবলিক লাইব্রেরি ২টি, সিনেমা হল ৬টি, মহিলা সমবায় সমিতি ১৪৫টি এবং খেলার মাঠ ১৩টি।

পেশা : মূল পেশা কৃষি ১৮.৬ শতাংশ, কুলি শ্রমিক ৯.৬৭ শতাংশ, শ্রম মজুরি, ব্যবসা ১৪.৮৪ শতাংশ, চাকুরি ৩.৬৯ শতাংশ, তাঁত শিল্প ১৩.২৭ শতাংশ, শিল্প শ্রমিক ৪.২৯ শতাংশ এবং অন্যান্য ১০. ৮ শতাংশ।

ভোটার : বেলকুচি নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলো ১ লাখ ৯৬ হাজার ২৩৯। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৯৯ হাজার ৪১১ আর মহিলা ভোটার ৯৬ হাজার ৮২৮। বেলকুচি নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র ছিলো ৮১টি; ভোটকক্ষ ছিলো ৪৯৯টি। ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম হয় বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র। ব্যালট বাক্স ছিনতাই হয়, পোলিং এজেন্টদের মারধর করে বের করে দেয় আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সমর্থক ও স্থানীয় মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাসের লোকজন।

মোট প্রার্থী : বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী ছিলেন ৪ জন। এরা হলেন : আলী আলম, ফজলুল হক সরকার, মফিজউদ্দিন খান লাল এবং ইমদাদুল হক এমদাদ। পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী ছিলেন আব্দুল হামিদ আকন্দ, আব্দুল খালেক তোতা ও মিজানুর রহমান। অন্যদিকে, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী ছিলেন মোছাম্মাত ছনিয়া সবুর এবং ফ্লোরা বেগম।

মো. আলী আলম : ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী হন। তিনি সিরাজগঞ্জ জেলা জামায়াতের সাবেক আমীর ছিলেন। ২২ জানুয়ারি সহিংসতার অভিযোগে নির্বাচন স্থগিত হলে ৬ এপ্রিল পুন:নির্বাচনে ৫২ হাজার ২০৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন।

ফজলুল হক সরকার : ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করে পরাজিত হন। বর্তমানে বেলকুচি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। সহিংসতার অভিযোগে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন স্থগিত হলে ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে ৪৫ হাজার ২০৬ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হন তিনি।

ইমদাদুল হক এমদাদ : ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়ে পরাজিত হন। তিনি জেলা জাতীয় পার্টির সাবেক নেতা এবং বর্তমানে বেলকুচি আওয়ামী লীগ নেতা। ২২ জানুয়ারির সহিংসতার অভিযোগে নির্বাচন স্থগিত হলে ৬ এপ্রিল পুন:নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয়। পুন:নির্বাচনের আগে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিলেও যেহেতু মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গিয়েছিলো, তাই প্রার্থীতা প্রত্যাহার হয়নি। পুন:নির্বাচনে ইমদাদুল হক এমদাদ আনারস প্রতীকে ১৯৬ ভোট পেয়েছিলেন।

মফিজউদ্দিন খান লাল : ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি থেকে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। ছাতা প্রতীকে নির্বাচন করে ৮৫০ ভোট পেয়ে তৃতীয় হন। তিনি ছিলেন বিএনপি সমর্থক। ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনের আগে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু নিদিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়ায় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার হয়নি; কাগজে কলমে তিনি প্রার্থী ছিলেন। মফিজউদ্দিন খান লালের ছাতা প্রতীকে জমা পড়ে ৮৫০টি ভোট। পরে বেলকুচি পৌরসভা নির্বাচনের আগে মফিজউদ্দিন খান লাল আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। বর্তমানে বেলকুচি পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

আব্দুল হামিদ আকন্দ : সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে (আওয়ামী লীগ সমর্থক) ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করে বিজয়ী হন। তিনি পান ৫০ হাজার ৭৯৫ হাজার ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

মো. আব্দুল খালেক খোকা : সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে (বিএনপি সমর্থক) ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করে পরাজিত হন আব্দুল খালেক তোতা। তিনি পান ৪৫ হাজার ৫৪০ ভোট।

মোছাম্মত ছনিয়া সবুর : বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে (আওয়ামী লীগ সমর্থক) মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন। তিনি পান ৫৩ হাজার ২০৬ ভোট।

ফ্লোরা বেগম : সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে (বিএনপি সমর্থক) মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন ফ্লোরা বেগম। তিনি পান ৪১ হাজার ৩৬৬ ভোট।

৩.৫ কেস স্টাডি : বেলকুচি উপজেলা নির্বাচন।

প্রেক্ষাপট : ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত তৃতীয় উপজেলা পরিষদে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচন।

নির্বাচনী আচরণবিধি ও বাস্তবায়ন :

বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে জামায়াত সমর্থক বিজয়ী প্রার্থী মো. আলী দাবি করেছেন, ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ফজলুল হক সরকার ব্যাপকভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেও অন্যরা করেননি। ভোটের সময় নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী ২৩" × ১৮" সাদা-কালো পোস্টার ছাপিয়েছেন, সাদা-কালো পোস্টার ছাপিয়েছেন বলে জানান। আর মৎস্য ও পশু সম্পদমন্ত্রী এবং তার পরিবারের সদস্যরা নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন বলে উঠেছিলো তা সত্য নয় বলেও দাবি করেন ফজলুল হক। তিনি বলেন, মন্ত্রী নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করেছেন এমন অভিযোগ করে সিইসি নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এমন খবর তিনি টেলিভিশনের মাধ্যমে জানতে পান। স্থগিতের খবরে তার কর্মী-সমর্থকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা বেলকুচি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস ঘেরাও করে রাখে। সে সময় অডিটরিয়ামে অবস্থান করছিলেন উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন ও উপজেলার শিক্ষা অফিসার তৌহিদুল ইসলাম। যদিও ঐ সময় তার সমর্থকদের দাবি ছিলো যে, যতটুকু ভোটগ্রহণ হয়েছে তার ভিত্তিতে ফলাফল ঘোষণা করতে। পরে অবস্থা আরো খারাপ হওয়ায় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সমঝোতায় তারা বৃহত্তর স্বার্থে নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং তার সমর্থকদের সেখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তারা চলে যায়। ফজলুল হক সরকার দাবি করেন, ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে তিনি আচরণবিধি মেনে প্রচার চালিয়েছন। তবে নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেলে পুন:নির্বাচনের আগে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর মৌখিক ঘোষণা দেন। যদিও নির্বাচনী আইন অনুযায়ী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় পার হয়ে গেলে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার কোন সুযোগ নাই। সেহেতু নির্বাচন থেকে নিজেকে সব ধরনের কাজ থেকে গুটিয়ে নিলেও নির্বাচনের আইন অনুযায়ী তার প্রার্থীতা বহাল থাকে। জাতীয় পার্টির সমর্থক প্রার্থী ইমদাদুল হক এমদাদ অবশ্য দাবি করেছেন, আচরণবিধি মেনেই প্রচার চালিয়েছেন। তার দাবি, ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে ব্যাপকভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন আওয়ামী লীগের সমর্থক প্রার্থী ফজলুল হক সরকার ও সমর্থকরা। নির্বাচনী আচরণবিধি প্রসঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিজয়ী প্রার্থী আব্দুল হামিদ আকন্দ বলেছেন, তিনিসহ নির্বাচনে অন্যান্য প্রার্থীরা নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেন নাই। আর আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিজয়ী মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাম্মত ছনিয়া সবুর বলেন, প্রার্থীরা নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেন নাই। তবে বিএনপি সমর্থিত পরাজিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী

ফ্লোরা বেগম বলেছেন, তিনি আচরণবিধি মেনেছিলেন, কিন্তু আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। এদিকে, বেলকুচি উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী মো. আব্দুল খালেক তোতার দাবি–তিনি আচরণবিধি মানলেও আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থী ফজলুল হক সরকার লঙ্ঘন করেছেন।

বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনের সময় সিরাজগঞ্জের জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা ছিলেন নিতিশ চন্দ্র দে (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত)। তার বক্তব্য হলো–২২ জানুয়ারি ভোটের দিন আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী ফজলুল হক সরকার ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুল হামিদ আকন্দের সমর্থকরা ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়েছেন। এছাড়া, মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাস ভোট দেয়ার পর কেন্দ্রে অবস্থান করেছেন ও বেশ কিছু কেন্দ্র ঘুরে দেখে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন স্থগিত হয় এবং মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তিনি মামলা করেন আচরণবিধ লঙ্ঘনের অভিযোগে। তবে ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে কোন প্রার্থী ও সমর্থকের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া যায়নি বলে জানান নিতিশ চন্দ্র।

আর পুন:নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের দৃশ্য চোখে পড়ে নাই বলে মত দিয়েছেন ৬ এপ্রিল নির্বাচনী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করা সাইফুল ইসলাম। এদিকে, নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে সাবেক নির্বাচন কমিশনার ছহুল হোসাইনের বক্তব্য হলো–এ অবস্থার জন্য রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদরাই দায়ী। সব সময় ক্ষমতাসীনরা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে। নবম সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণহয়েছিলো; কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হওয়ার পাশাপাশি পুরো দেশে সেনা মোতায়েন ছিলো। অন্যদিকে, তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হয়েছিলো রাজনৈতিক সরকারের অধীনে। সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাস তার সমর্থক চেয়ারম্যান প্রার্থীকে বিজয়ী করার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত সফল হন নাই। ছহুল হোসাইনের মতে, আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিতের পাশাপাশি সবার সহযোগিতা থাকা জরুরি। নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে নির্বাচন সুষ্ঠু করা সম্ভব না।

নির্বাচনী পরিবেশ :

বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি সমর্থক চেয়ারম্যান প্রার্থী মফিজউদ্দিন খান লালের বক্তব্য হলো–ঐ সময়ে বিএনপি'র কিছু লোক নির্বাচনে তার বিরুদ্ধে কাজ করেছিলো; তাই ক্ষোভে-দু:খে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন। মফিজউদ্দিনের দাবি–তিনি বিএনপি নেতা মেজর (অব.) মঞ্জুর কাদেরের সমর্থক ছিলেন। উপজেলা নির্বাচনের পরে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে বেলকুচি পৌরসভা নির্বাচনে বিজয়ী হন। বর্তমানে তিনি সিরাজগঞ্জের বেলকুচি পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী ইমদাদুল হক এমদাদের অভিযোগ–রাজনৈতিক সরকারের

আমলে নির্বাচন হওয়ায় আওয়ামী লীগের সমর্থক প্রার্থী অনিয়ম আর প্রভাব বিস্তার করেছেন। যেহেতু, ফজলুল হক সরকার স্থানীয় মন্ত্রীর লতিফ বিশ্বাসের লোক ছিলেন তাই মন্ত্রীও নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করেছেন। এটি করায় নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিলো। কমিশনের কর্মকর্তারা নিজেরাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন বলেও তিনি মনে করেন। এদিকে, জাতীয় পার্টি সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী ইমদাদুল হক এমদাদের অভিযোগ অনেক কেন্দ্রে তচাঁর এজেন্টসহ অন্য আরো দুই চেয়ারম্যান প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের হুমকি আর ভয় দেখিয়ে বের করে দেয়া হয়েছিলো। এমদাদের মতে, ভোটের দিন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব খারাপ ছিলো।

চেয়ারম্যান প্রার্থী ফজলুল হক সরকারের লোকজন কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাইসহ পোলিং এজেন্টদের মারধর করে কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়েছিলো। কমিশনের কর্মকর্তারা নিজেরাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন বলে উল্লেখ করেন ইমদাদুল হক। এদিকে, ভাইস চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিজয়ী প্রার্থী আব্দুল হামিদ আকন্দের বক্তব্য হলো–নির্বাচনের দিন গ্যাঞ্জাম হয়েছে, কিছু কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের খবর তিনি শুনেছেন, তবে দেখেন নাই। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলার কথা শুনেছেন; তবে তাকে আচরণবিধি লঙ্ঘন করতে দেখেন নাই। অন্যদিকে, বিএনপি সমর্থিত ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুল খালেক তোতার অভিযোগ, ২২ জানুয়ারি নির্বাচনে কেন্দ্রে ঢুকে আওয়ামী লীগের লোকজন তার পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়। কেন্দ্র দখল করে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, জাল ভোট দেয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় অনিয়ম করলেও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী কোন ব্যবস্থা নেয় নাই। শুধু তাই নয় উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন ও তৌহিদুর রহমানকে শারিরিকভাবে হামলা করলেও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আইনের কোন প্রয়োগ করে নাই বলেও অভিযোগ আব্দুল খালেক তোতার ।

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিজয়ী প্রার্থী সোনিয়া সবুর নির্বাচনী পরিবেশ সম্পর্কে বলেন, ভোটের দিন তিনি নির্বাচনী সহিংসতা বা অনিয়ম সম্পর্কে কিছু দেখেন নাই। তবে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাস, তার মেয়ে সোমা বিশ্বাস, মেয়ের জামাই, মন্ত্রীর এপিএসসহ তার কিছু লোকজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিলো বলে তিনি শুনেছেন। অন্যদিকে, বিএনপি দলীয় পরাজিত প্রার্থী ফ্লোরা বেগমের অভিযোগ–২২ জানুয়ারির নির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতা হয়েছে, ব্যালট বাক্স ছিনতাই হয়েছে; তার এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থীর কর্মীরা প্রতি কেন্দ্রে একাধিক পোলিং এজেন্ট নিয়োগ দিয়েছিলো উল্লেখ করে ফ্লোরা বেগম অভিযোগ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

নির্বাচনী পরিবেশ সম্পর্কে বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেনের বক্তব্য হলো–২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের দিন সহিংসতা হয়েছে। সকাল ৮টায় ভোট নেয়া শুরুর পর পরই ১টি কেন্দ্র

থেকে খবর আসে সেখানে সহিংসতা হচ্ছে; ভোটাররা ব্যালট বাক্স ছিনতাই করছে, জোর করে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে ভোটারদের বাধ্য করা হচ্ছে। এ অবস্থায় ঢাকায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার দিকে বেলকুচি নির্বাচন স্থগিত করতে রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ দেয়া হয়। নির্বাচন স্থগিত হলে দুপুর ১২টার দিকে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নির্বাচনী মালামাল রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে ফেরত আসতে শুরু করে। কেন্দ্রগুলোর প্রিসাইডিং অফিসারের কাছ থেকে নির্বাচনী রিপোর্ট লিখিত (স্টেটমেন্ট) আকারে নেয়ার সময় উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী ফজলুল হক সরকার এবং তার লোকজন মোশাররফ হোসেন ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার তৌহিদুল ইসলামের উপর হামলা করে। হামলাকারিরা তাদের লাথি ও কিল-ঘুষি মেরে আহত করে। শুধু তাই নয়, ফজলুল হক সরকারের হাজারো সমর্থক তাদের দুজনকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে আটকে রাখে। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর লোকজন বেলকুচি উপজেলা নির্বাহী অফিসে আসলেও কার্যত: কোন ব্যবস্থা নিতে পারে নাই রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে। পরে বিকেল ৪টার দিকে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ২টি ফোর্স এসে তাদের উদ্ধার করে বলে জানান মোশাররফ হোসেন।

এছাড়া, বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনের পরিবেশ বিষয়ে বেসরকারি টেলিভিশন আরটিভির সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি সুকান্ত সেন জানান, ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে কেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়া, ব্যালট বাক্স ছিনতাইসহ নানা অনিয়ম হয়েছিলো। ফলে, নির্বাচন স্থগিত করেছিলো কমিশন।

নির্বাচনের আগে ও পরে সহিংসতা :

বেলকুচি উপজেলার বিজয়ী চেয়ারম্যান আলী আলম জানিয়েছেন–ভোটের পরে কোন সহিংসতা হয়নি; তবে ভোটের দিন সকাল বেলা থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী ফজলুল হক সরকার এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাসের লোকজন বাকি ৩ চেয়ারম্যান প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। শুধু তাই নয় নির্বাচন স্থগিত হওয়ার পর বেলকুচি উপজেলা নির্বাচন অফিসার মোশাররফ হোসেন ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার তৌহিদুল ইসলামের উপর হামলা করে তাদের আহত করে আওয়ামী লীগের লোকজন। এদিকে, ভোটের আগে ও পরে সহিংসতা হয়নি বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সমর্থক উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী ফজলুল হক সরকার।

এ বিষয়ে পরাজিত আরেক চেয়ারম্যান প্রার্থী ইমদাদুল হক জানান, ভোটের দিন সহিংসতা হলেও নির্বাচনের আগে ও পরে সন্ত্রাস হয় নাই। পরাজিত আরেক প্রার্থী মফিজউদ্দিন খান লালের বক্তব্য কিছুটা ভিন্নধর্মী। ভোটের দিন কিছু ঝামেলা হয়েছিলো বলে তিনি শুনেছেন। এ জন্য ২২ জানুয়ারি নির্বাচন স্থগিত হয়েছিলো। আর ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনের দিন তিনি ঢাকায় ছিলেন বিধায় ঐ দিন কি ঘটেছে তা তার জানা নেই।

পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী প্রার্থী আব্দুল হামিদ আকন্দ বলেন, ভোটের দিন সকালে দু'একটি কেন্দ্রে সামান্য কিছু অনিয়ম অর্থাৎ হাঙ্গামা হয়েছিলো। যে কারণে নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। তবে ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ছনিয়া সবুরের বক্তব্য–ভোটের পরে কোন মারামারি হয় নাই।

নির্বাচনের সময় বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনকারি কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন বলেন, ২২ জানুয়ারি হলেও ভোটের পরে সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি।

পুন:নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত আরেক নির্বাচনী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলামের মতে, ৬ এপ্রিলের নির্বাচনে কোন সহিংসতা হয়নি; সংঘাত ঠেকাতে স্থানীয় প্রশাসন খুব সতর্ক ছিলো। তবে মানুষের মধ্যে ভয় কাজ করতে দেখা গেছে; তাদের আশংকা ছিলো স্থানীয় মন্ত্রীর লোকজন নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আর বেলকুচি প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ইত্তেফাকের বেলকুচি প্রতিনিধি সাইদুর রহমানের বক্তব্য হলো–ভোটের পরে সহিংসতা না হলেও ভোটের দিন হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও কঠোর ছিলোনা ২২ জানুয়ারির ভোটের সময়। তবে ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোর ছিলো বিধায় নির্বাচনে অনিয়ম হয়নি।

বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনের মূল্যায়ন :

নির্বাচনে জামায়াত সমর্থিত বিজয়ী প্রার্থী মো. আলী আলমের বক্তব্য হলো–৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচন সার্বিকভাবে শান্তিপূর্ণও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। যদিও তার প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত প্রার্থী চেয়েছিলেন নির্বাচনের ফলাফল ছিনিয়ে নিতে কিন্তু বেলকুচির সাধারণ ভোটাররা প্রহরির ভূমিকা পালন করেছে। তারা সুষ্ঠুভাবে লাইনে দাঁড়িয়েছে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে। কাউকে অনিয়ম আর সন্ত্রাসী কাজ করতে দেয় নাই আবার তারা কাউকে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে দেন নাই। আলী আলমের মতে, ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচন মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। অন্যদিকে, ফজলুল হক সরকারের বক্তব্য-যদিও নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন তবুও পুন:নির্বাচন সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আরেক চেয়ারম্যান প্রার্থী মফিজউদ্দিন খান লাল বলেন, ভোটের দিন ফজলুল হক সরকার আর মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাসের লোকজন নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। যে কারণে, ২২ জানুয়ারির নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। এ বিষয়ে জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থী ইমদাদুল হক এমদাদ বলেন, ২২ জানুয়ারির নির্বাচন অনিয়ম ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হলেও ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে।

বেলকুচি নির্বাচনে পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন দু'জন। আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিজয়ী প্রার্থী আব্দুল হামিদ আকন্দ জানান, ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে কিছু অনিয়ম হয়েছিলো বলেই নির্বাচন স্থগিত হয়েছিলো। তবে, পরবর্তীতে ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছিলো।

পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুল খালেক তোতা অবশ্য বলেছেন, প্রথমে ২২ জানুয়ারিতে সহিংসতা হয়েছিলো বলেই নির্বাচন স্থগিত করেছিলো নির্বাচন কমিশন। পরে ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে প্রশাসন শক্ত অবস্থান নেয়ায় নির্বাচন অনেক ভালো হয়েছিলো। যদিও আওয়ামী লীগের লোকজন চেষ্টা করেছিলো নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করতে। কিন্তু প্রশাসন আর নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের কঠোর মনোভাবের কারণে সেটি করা সম্ভব হয় নাই।

এদিকে, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী প্রার্থী সোনিয়া সবুরের মতে নির্বাচন ভালোই হয়েছে। তবে ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচন অনেক কঠিন হয়েছিলো। তিনি ভোট দেয়ার পর কেন্দ্রে থাকতে পারেন নাই। প্রশাসনের কর্মকর্তারা তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলো।

এ বিষয়ে বিএনপি সমর্থিত পরাজিত প্রার্থী ফ্লোরা বেগমের দাবি, তার ভোট ৬ হাজার বাতিল দেখানো হয়েছে। ভোটের ফলাফল উল্টানো হয়েছে; তিনি যত ভোট পেয়েছেন সেটা বিজয়ী প্রার্থীকে দেখানো হয়েছে আর পরাজিত প্রার্থীর ভোট তাকে (ফ্লোরা বেগমকে) দেয়া হয়েছে। প্রশাসনের লোকজন মন্ত্রীর পক্ষে কাজ করেছে বিধায় নির্বাচন সুষ্ঠু হয় নাই। তবে ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে প্রশাসন খুব কঠোর ভূমিকায় ছিলো বলে কোন অনিয়ম আর মারামারি হয় নাই।

সার্বিকভাবে বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ঐ সময়ের সাবেক সিইসি ড. শামসুল হুদার বক্তব্য–২২ জানুয়ারির নির্বাচন সহিংসতার জন্য স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নেয়ায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণসম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে সাবেক নির্বাচন কমিশনার ছহুল হোসাইন বলেন–২২ জানুয়ারির নির্বাচনে অনিয়ম হয়েছিলো। চেয়ারম্যান প্রার্থী ফজলুল হক সরকারের লোকজন বিপক্ষ দলের পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়েছিলো, ব্যালট বাক্স ছিনতাই করেছিলো। শুধু তাই নয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী ভোট দিয়ে এলাকায় অবস্থান করেন এবং কেন্দ্রে গিয়ে প্রভাব বিস্তার র চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ পায় কমিশন। অভিযোগের ভিত্তিতে সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে দিয়ে মন্ত্রীকে ভোট কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। পরে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বেলকুচি উপজেলা নির্বাচন স্থগিত করা হয়। ঐ উপজেলায় ৬ এপ্রিল পুন:নির্বাচন হয়। ঐ নির্বাচনে ইসির কর্মকর্তা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী আর প্রশাসন খুবই কঠোর ছিলো বলে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছিলো। ৬ এপ্রিলের নির্বাচনে কোন ধরনের ঝামেলা হয় নাই বলেও জানান ছহুল হোসাইন।

২২ জানুয়ারির নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের সময় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের হাতে শারিরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন। তিনি জানান–নির্বাচনী সহিংসতা, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও মৎস ও পশুসম্পদ মন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাসের নির্বাচনী আচরণবিধি লংঘনের কারণে নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। তাই বলা যায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়নি।

বেলকুচির ২২ জানুয়ারির নির্বাচন স্থগিত হওয়ার পর পুন:নির্বাচনের আগে উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তার দায়িত্ব পাওয়া সাইফুল ইসলামের (বর্তমানে শেরপুর সদর উপজেলার নির্বাচনী কর্মকর্তা) মতে, ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে শান্তিপূর্ণহয়েছিলো। ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের পর স্থানীয় প্রশাসন খুব সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন পরিচালনা করেছিলো। কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন কমিশন ও সরকারের পক্ষ থেকে চাপ ছিলো যে কোন উপায়ে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করার। ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাসের পরিবারের লোকজন ও তার সমর্থকরা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করায় স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন খুব সজাগ ছিলো যাতে কেউ যেন নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে। ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের পর উপজেলার দায়িত্ব পাবার পর সাইফুল ইসলাম ঐ নির্বাচনে ব্যবহৃত ৭টি ব্যালট বাক্স ভাঙা অবস্থায় পেয়েছেন। পরে অবশ্য রিজার্ভ ব্যালট বাক্স থেকে নিয়ে পূরণ করে ৬ এপ্রিলের নির্বাচনে সেগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এজন্য আইন খুব কঠোরভাবে আরোপ করা হয়েছিলো বিধায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণসম্পন্ন হয়েছিলো। যেহেতু পুন:নির্বাচন হয়েছিলো সে জন্য সহিংসতার আশংকায় মহিলা ভোটারের উপস্থিতি কম ছিলো। ৬ এপ্রিলের নির্বাচনে ভোটার খুব বেশি ছিলো না। ২২ জানুয়ারিতে সেনা মোতায়েন থাকলেও ৬ এপ্রিলের নির্বাচনে তা হয় নাই। আর ২২ জানুয়ারি নির্বাচনে দায়িত্বপালনকারি বেলকুচি উপজেলার শিক্ষা অফিসার ও বর্তমানে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ২২ জানুয়ারি নির্বাচনে সরকারদলীয় রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করেছে বলে নির্বাচনে অনিয়ম ও সহিংসতা হয়েছে।

নির্বাচনের দিন পোলিং এজেন্টদের নির্বিঘ্নে দায়িত্ব পালন :

জামায়াত সমর্থিত বিজয়ী প্রার্থী আলী আলমের অভিযোগ–ভোটের দিন সকাল বেলায় অনেক কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর লোকজন তার ও অন্য প্রার্থীর এজেন্টদের ভয় দেখিয়ে বের করে দিয়েছিলো। অন্যদিকে, ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে কিছু কিছু পোলিং অফিসার চেয়ারম্যান প্রার্থী আলী আলমের পক্ষে কাজ করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী ফজলুল হক সরকার। তার দাবি ২২ জানুয়ারির নির্বাচন স্থগিত হওয়ার পর বেশ কিছু পোলিং অফিসারকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে সেখানে নতুন কিছু অফিসারকে দায়িত্ব দেয়া হয়। নতুন ঐ সব পোলিং অফিসারদের মধ্যে বেশ কিছু স্কুল শিক্ষক জামায়াত সমর্থক আলী আলমের পক্ষে কাজ করেছেন বিধায় তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। এদিকে, জাতীয় পার্টি সমর্থিত চেয়ারম্যান

প্রার্থী ইমদাদুল হক এমদাদের অভিযোগ–২২ জানুয়ারির নির্বাচনে অনেক কেন্দ্রে তার , আলী আলম ও মফিজউদ্দিন খান লালের এজেন্টদের হুমকি আর ভয় দেখিয়ে বের করে দিয়েছিলো ফজলুল হক সরকারের সমর্থকরা। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী প্রার্থী সোনিয়া সবুর জানান, ভোটের দিন পোলিং এজেন্টরা ভয়-ভীতি আর কোন ধরনের হুমকি ছাড়াই তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তবে পরাজিত প্রার্থী ফ্লোরা বেগম অবশ্য অভিযোগ করে বলেছেন, সকালে কেন্দ্রে গিয়ে দেখেন তার পোলিং এজেন্টদের মারধর করা হয়েছে, কেন্দ্র থেকে জোর করে বের করে দেয়া হয়েছে। মুলকান্দি প্রাইমারি স্কুল, ক্ষিদচার্পী প্রাইমারি স্কুল থেকে তার এজেন্টদের বের করে দিয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর লোকজন। এছাড়া, কেন্দ্রগুলোতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর একাধিক এজেন্ট ছিলো বলেও অভিযোগ ফ্লোরা বেগমের।

এদিকে, ভাইস চেয়ারম্যান পদে পরাজিত প্রার্থী আব্দুল খালেক তোতার অভিযোগ–২২ জানুয়ারির নির্বাচনের দিন ফজলুল হক সরকারের লোকজন তার এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়েছিলো। তবে ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে অবশ্য এটি হয় নাই। পুন:নির্বাচনে উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনকারি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম (বর্তমানে শেরপুর সদর উপজেলার নির্বাচনী কর্মকর্তা) বলেন, ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে বের করে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায় নাই; বরং অনেকটা শান্তিপূর্ণভাবেই নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছিলো।

নির্বাচনকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর হুমকি :

জামায়াত সমর্থিত বেলকুচি উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী আলী আলমের অভিযোগ -নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে তাকে হুমকি দিয়েছিলো স্থানীয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আর মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাসের লোকজন। তবে আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী ফজলুল হক সরকার অভিযোগ অস্বীকার করে অবশ্য বলেছেন, কোন প্রার্থী নির্বাচনের সময় তাকে কোন ধরনের হুমকি দেয়নি। এদিকে, জাতীয় পার্টি সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী ইমদাদুল হক এমদাদ অভিযোগ করে বলেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী সোনিয়া সবুর জানান, কেউ তাকে হুমকি দেয় নাই। আরেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফ্লোরা বেগমেরও একই কথা। তিনি জানান, প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের সমর্থক এক প্রার্থী তাকে নির্বাচন থেকে সরে যেতে বলেছিলো। তার স্বামীকে বলা হয়েছিলো, তিনি যেন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুল খালেক তোতা জানান, তাকে কেউ হুমকি দেয়নি। এ বিষয়ে মানবজমিন পত্রিকার বেলকুচি সংবাদদাতা গোলাম মোস্তফা রুবেল জানন, নির্বাচনের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা একে অপরকে হুমকি দেয়নি তবে ২২ জানুয়ারি ভোটের দিন সরকার সমর্থক চেয়ারম্যান প্রার্থীর লোকজন অন্যান্য প্রার্থীর এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের সময় বেলকুচি উপজেলার শিক্ষা অফিসার (বর্তমানে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর

উপজেলা শিক্ষা অফিসার), যিনি নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন তার বক্তব্য হলো–ভোটের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা একে অপরকে হুমকি দেননি বলেই তিনি জেনেছেন; তবে আওয়ামী লীগের এক মন্ত্রীর সমর্থক চেয়ারম্যান প্রার্থীর লোকজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়ার অভিযোগ শুনেছেন। শুধু তাই নয়, ঐ প্রার্থীর সমর্থকরা নির্বাচনী ব্যালটবাক্স ছিনতাই পর্যন্ত করেছে বলে নির্বাচনের দিন তিনি অভিযোগ পেয়েছেন।

নির্বাচন সুষ্ঠু করতে ইসি'র কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন :

নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী আলী আলমের মতে, নির্বাচনী কর্মকর্তারা নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করেছেন। তবে আওয়ামী লীগের সমর্থক চেয়ারম্যান প্রার্থী ফজলুল হক সরকার, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাসের মেয়ে ও মন্ত্রীর লোকজন নির্বাচনে এত বেশি প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিলো যে, কমিশনের কর্মকর্তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচন স্থগিত হওয়ার পর বেলকুচি নির্বাচনী অফিসার মোশাররফ হোসেনসহ বেশ ক'জন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয় নিরাপত্তাজনিত কারণে। যদিও ৬ এপ্রিলের স্থগিত নির্বাচনে কমিশনের কর্মকর্তারা কিছুটা চাপের মধ্যে থাকলেও মোটামুটিভাবে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পেরেছিলেন। এদিকে, ফজলুল হক সরকারের অভিযোগ–বেলকুচি উপজেলা নির্বাচন অফিসার মোশাররফ হোসেন, বেলকুচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরমান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাসির উদ্দিন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কাজ করেছিলো তাকে পরাজিত করতে। তিনি জানান, বিভিন্ন সোর্স থেকে জানতে পারেন কিছু মানুষ অর্থের বিনিময়ে চেয়ারম্যান প্রার্থী আলী আলমের পক্ষে কাজ করেছেন। আব্দুল হামিদ আকন্দ বলেন, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের ভূমিকা নিরপেক্ষ ছিলো। ইসির কর্মকর্তারাও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আর নির্বাচনে বিজয়ী মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সোনিয়া সবুর বলেন, কমিশন নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেছিলো। এ বিষয়ে পরাজিত ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক তোতা বলেন, ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে ইসি'র কর্মকর্তা, প্রশাসনের কর্মকর্তারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেন নাই। তারা সঠিকভাবে কাজ করলে নির্বাচন সুষ্ঠু হতো। তবে ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

২০০৯ সালের ৬ এপ্রিলের নির্বাচনে বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনকারি সাইফুল ইসলাম (বর্তমানে শেরপুর সদর উপজেলার নির্বাচনী কর্মকর্তা) বলেন, সার্বিকভাবে পুন:নির্বাচন ভালো হয়েছে বলা যায়। কারণ, ২২ জানুয়ারির সহিংসপূর্ণ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে ছিলো। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন যে কোন উপায়ে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ও সহিংসতামুক্ত রাখার। এটি সফল হওয়ার অন্যতম কারণ ছিলো নির্বাচন কমিশন থেকে মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাসকে আগে থেকেই জানানো হয়েছিলো তিনি

Dhaka University Institutional Repository

যেন ভোটের দিন কেন্দ্রে না আসেন। মন্ত্রীও কমিশনের কথা শুনেছেন। তিনি কেন্দ্রে ভোট দিতে যান নাই, তার কর্মী সমর্থকরাও নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে নাই। আর বেলকুচি প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ইত্তেফাকের বেলকুচি সংবাদদাতা সাইদুর রহমান বলেছেন, ২২ জানুয়ারিতে নির্বাচনের দায়িত্বপালনকারি কর্মকর্তারা স্থানীয় মন্ত্রী ও তার সমর্থক চেয়ারম্যান প্রার্থীর লোকজনের কাছে অসহায় ছিলো। তবে, ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে প্রশাসন অত্যন্ত কঠোর হওয়ায় নির্বাচনী কর্মকর্তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেয়েছেন।

নির্বাচনে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আচরণবিধি লঙ্ঘন :

বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে বিজয়ী চেয়াম্যান আলী আলম জানান, ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ফজলুল হক সরকার ব্যাপকভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেও অন্যরা করেননি। তবে পরাজিত ফজলুল হক সরকার বলেন, তার জানা মতে প্রার্থীরা আচরণবিধি লঙ্ঘন করেন নাই। ইমদাদুল হক এমদাদের অভিযোগ, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিলো তাই বেলকুচি নির্বাচনে দলটির সমর্থিত প্রার্থী প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রার্থী ফজলুল হক স্থানীয় মন্ত্রীর সমর্থক ছিলেন তাই মন্ত্রীও নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করেছে। আর এটি করে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলো তারা।

২২ জানুয়ারি বেলকুচি উপজেলায় নির্বাচনী কর্মকর্তার দায়িত্বপালনকারি মোশাররফ হোসেন (বর্তমানে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সহকারি সচিব) জানান, ভোটের দিন মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাস আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছিলেন। মন্ত্রী ভোটের দিন কেন্দ্রে ভোট দিয়ে অবস্থান করেন এবং বেশ ক'টি কেন্দ্র ঘুরে দেখে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করেন বলে তিনি ভোটের দিন খবর পান। এছাড়া, মন্ত্রীর স্ত্রী ও মেয়ে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেন। এরই প্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জ জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা ঢাকায় নির্বাচন কমিশন সচিব হুমায়ুন কবিরের নির্দেশে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন। মামলা নং ৩০/২০০৯। যেখানে মন্ত্রীকে ১ নম্বর আসামী করা হয় এবং তার মেয়ে সোমা বিশ্বাস ও মন্ত্রীর একান্ত সচিব হিলটনকে ৫ ও ৬ নম্বর আসামী করা হয়।

এ প্রসঙ্গে সাবেক সিইসি ড. শামসুল হুদা বলেন, ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনের দিন স্থানীয় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাস নির্বাচনের দিন আচরণবিধি লঙ্ঘন করে কেন্দ্র ঘুরে দেখেছেন আর প্রভাব বিস্তার করেছেন। পোলিং অফিসারদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন, তিনি বেলকুচির নির্বাচনী কর্মকর্তা মোশাররফকে মারতে পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সিইসি হিসেবে মোশাররফকে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করতে বলেছিলেন; তবে মোশাররফ ভয়ে রাজি হননি। তাকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার কথা বলা হয়েছিলো, সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা পর্যন্ত দিতে বলা হলেও তিনি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করেননি। ড. শামসুল হুদার বক্তব্য হলো–প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে কেউ মামলা করতে

চায়না। স্বাক্ষী দিলে ভয় দেখায়, গুম করে ফেলে; শারিরিকভাবে নির্যাতন করে। শুধু তাই নয় বাড়িতে পর্যন্ত হামলা করে। সাবেক ইসি ছহুল হোসাইনের মতে, যারা প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে মামলা করে তাকে ঐ প্রভাবশালী ব্যক্তি নানাভাবে হয়রানি করে, হুমকি দেয়। বাড়িতে হামলা করে, পরিবারের সদস্যদের গুম পর্যন্ত করে বলে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয় না। মানবজমিনের বেলকুচি প্রতিনিধি গোলাম মোস্তফা রুবেল জানায়, ২২ জানুয়ারি নির্বাচনের দিন সকাল ৯ টা থেকে প্রায় ১টা পর্যন্ত অনেক কেন্দ্রে কারচুপি আর অনিয়ম হয়েছে।

ভোটের দিন সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি :

বিজয়ী চেয়ারম্যান আলী আলমের অভিযোগ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীকে মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাস ও ফজলুল হক সরকারের লোকজন জিম্মি করে রেখেছিলো। পুলিশ, আর্মি, র‍্যাব, আনসারসহ বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা মোতায়েন থাকলেও আওয়ামী লীগের প্রার্থী, মৎস্য ও পশু সম্পদমন্ত্রীর লোকজনের প্রভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী কোন অ্যাকশনে যেতে পারেনি। এ জন্য ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও পোলিং এজেন্টদের মারধর আর নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের উপর হামলা হয়েছিলো। তবে ঐ নির্বাচন স্থগিতের পর ৬ এপ্রিলের নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী কঠোর ছিলো বলে ফজলুল হক সরকার আর মন্ত্রীর লোকজন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করতে পারে নাই।

এদিকে, পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী ফজলুল হক সরকারের দাবি তার, মৎস্য ও পশু সম্পদমন্ত্রী ও মন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সঠিক নয়। কারণ, মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাস লতিফা নগর বালিকা বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে সকাল ৯টার দিকে ভোট দিয়ে ঢাকায় চলে যান। সুতরাং মন্ত্রী নির্বাচনে প্রভাব খাটিয়েছেন ও তার (ফজলুল হকের) পক্ষে কাজ করে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন বলে যে অভিযোগ কমিশন করেছিলো তা ঠিক নয় বলে দাবি করেন। ফজলুল হকের অভিযোগ–বেলকুচি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাসির উদ্দিন, বেলকুচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে নির্বাচন স্থগিত করায়। মৎস ও পশুসম্পদ মন্ত্রী নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করেছেন এমন অভিযোগ করে সিইসি নির্বাচন স্থগিতের যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন তিনি খবরটি টেলিভিশনের মাধ্যমে জানতে পান। ভোট স্থগিতের সিদ্ধান্ত দেখে তার সমর্থকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা বেলকুচি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস ঘেরাও করে। সে সময় অডিটরিয়ামে অবস্থান করছিলেন উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার তৌহিদুল ইসলাম। যদিও ঐ সময় সমর্থকদের দাবি ছিলো, যতটুকু সময় পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হয়েছে সেটির ভিত্তিতে ফলাফল ঘোষণা করতে। পরে অবস্থা আরো খারাপ হওয়ায় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সমঝোতায় বৃহত্তর স্বার্থে নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং সমর্থক ভোটারদের সেখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তারা চলে যায়।

এদিকে, ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন (বর্তমানে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সহকারি সচিব) বলেন, প্রার্থী ও ভোটাররা নির্বাচনের দিন আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর সদস্যরা আইনের প্রয়োগ করেনি। ভোটের দিন বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও সহিংসতার পর পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

এ বিষয়ে বেলকুচি নির্বাচন কাভার করা আরটিভি'র সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি সুকান্ত সেন জানান, ২২ জানুয়ারির দিন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর সদস্যরা আইনের কঠোর প্রয়োগ করলে নির্বাচনী সহিংসতা এড়ানো যেতো। ভোটের শুরুতে তারা সেটি করেনি, যে কারণে নির্বাচন স্থগিত হয়েছিলো। আর বেলকুচি প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বলেন, ২২ জানুয়ারির দিন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর সদস্যরা আইনের কঠোর প্রয়োগ করলে নির্বাচনী সহিংসতা এড়ানো যেতো। দৈনিক মানব জমিনের বেলকুচি প্রতিনিধি গোলাম গোলাম মোস্তফা রুবেল জানান, ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই হয়েছে, জাল ভোট দেয়া হয়েছে; এ সবই করেছে স্থানীয় সরকারদলীয় মন্ত্রীর সমর্থকরা। এ বিষয়ে সাবেক সিইসি ড. শামসুল হুদার বক্তব্য হলো : বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়েছিলো। মন্ত্রী সার্বক্ষণিক ভোটের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ড. শামসুল হুদা জানান, আইন হচ্ছে মন্ত্রী হয়ে নির্বাচনের সময় এলাকায় থাকতে পারবেন না। শুধু ভোট দিতে পারলেও সেখানে অবস্থান করতে পারবেন না। কিন্তু মৎস্য ও পশু সম্পদমন্ত্রী মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাস বেশ কিছু কেন্দ্র ঘুরে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছেন। পোলিং অফিসারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন, ভয় দেখিয়েছেন; এমনকি উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেনকে মারতে গিয়েছিলেন।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার ছহুল হোসাইন জানান, ২২ জানুয়ারি ভোটের দিন স্থানীয় মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাস ভোট দিয়ে কেন্দ্রে অবস্থান করেন এবং বেশ ক'টি কেন্দ্র ঘুরে দেখেন বলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ আসে। অন্যদিকে, বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী ফজলুল হক সরকার ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুল হামিদ আকন্দের সমর্থক আওয়ামী লীগের লোকজন বেশ কিছু কেন্দ্রের ব্যালট বাক্স ছিনতাই, পোলিং এজেন্টদের মারধর করে বলে অভিযোগ পান। পরে খোঁজ খবর নিয়ে নির্বাচন কমিশন অভিযোগের সত্যতা পায় এবং স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে স্থানীয় মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাসকে নির্বাচনের ঐ এলাকা থেকে চলে বাধ্য করেন। সবশেষে, তারা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বেলকুচি নির্বাচন স্থগিত করেন বলে জানান ছহুল হোসাইন। এ প্রসঙ্গে সিরাজগঞ্জ জেলার সাবেক নির্বাচনী কর্মকর্তা নিতিশ চন্দ্র দে বলেন, প্রার্থী ও ভোটাররা নির্বাচনের দিন আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী আইনের প্রয়োগ করেনি।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা :

বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনের বিজয়ী চেয়ারম্যান আলী আলম জানান, ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে কমিশন ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা কঠোর ছিলো। ফজলুল হক ও মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাসের লোকজন চেষ্টা করেছিলো ভোটের ফলাফল পাল্টে দিতে কিন্তু কমিশনের তৎপরতার জন্য সেটি সম্ভব হয়নি। পরাজিত ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক তোতা বলেন, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করেছিলো ঠিকই তবে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ছিলো। তারা কঠোর হলে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন স্থগিত হতোনা। এ বিষয়ে সাবেক নির্বাচন কমিশনার মুহাম্মদ ছহুল হোসাইন বলেন, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা নিরপেক্ষতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করেছিলো। তাদের কারো বিরুদ্ধে অনিয়ম বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আসেনি। এ বিষয়ে মানব জমিন পত্রিকার বেলকুচি প্রতিনিধি গোলাম মোস্তফা রুবেল জানান, ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের দিন প্রথম ৪ ঘন্টায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী নিষ্ক্রিয় ছিলো। তবে ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে স্থানিয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন কঠোর থাকায় পুলিশ, আনসার, র‌্যাব ও আর্মির তৎপরতা বেড়ে যায়।

নির্বাচনী মামলা :

২২ জানুয়ারির নির্বাচনে উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন (বর্তমানে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সহকারি সচিব) জানান, সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবির ও সহকারি রিটার্নিং অফিসার নাসির উদ্দিনের নির্দেশে তিনি চেয়ারম্যান প্রার্থী, ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ও তাদের সমর্থকসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করলেও প্রায় ৬ মাস পরে ঐ মামলা খারিজ হয়ে যায়। কারণ, ঐ মামলায় তার পক্ষে যে ৩ জন স্বাক্ষী ছিলেন তারা (প্রথম স্বাক্ষী মো. নাসির উদ্দিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দ্বিতীয় স্বাক্ষী তৌহিদুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার (বর্তমানে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার) এবং তৃতীয় স্বাক্ষী মুহাম্মদ শহীদুল করিম, বেলকুচি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার) স্বাক্ষ্য দিতে বিব্রত হন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে। ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের পর তাকে ভোলা জেলার তজুমদ্দিন উপজেলায় নির্বাচন অফিসার হিসেবে বদলি করা হয়। তাকে ভোলা থেকে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় গিয়ে মামলার স্বাক্ষ্য দিতে হতো। চাকুরিকালিন সময়ে এতো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সেখানে গিয়ে স্বাক্ষ্য দেয়া জন্য খুবই কষ্টের ও বিব্রতকর ছিলো। তাছাড়া, পুলিশ যে ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট দেয় সেখানে উল্লেখ করা হয় যে, উপজেলা নির্বাচনে কোন সহিংসতা হয় নাই। পরে সে সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি পুলিশের ইনভেস্টিগেশনের সঙ্গে একমত পোষন করেন এবং নিজেও স্বাক্ষ্য দেন যে, নির্বাচনী সহিংসতা সম্পর্কে তিনি নিজের চোখে কিছু দেখেননি; তবে যে কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও সহিংসতা হয়েছিলো সেই কেন্দ্র থেকে তাকে তথ্য জানানো হয়েছিলো। পরে ঐ মামলাটি খারিজ হয়ে যায়।

উপসংহার :

গবেষণালব্ধ ফলাফলে পাওয়া গেছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত ঢাকা-৬ নির্বাচন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণও গ্রহণযোগ্য সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে, ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারির তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সরকার সমর্থক প্রার্থীর লোকজন সহিংসতা ও অনিয়ম করলে নির্বাচন স্থগিত হয়। পরে ৬ এপ্রিলের পুন:নির্বাচনে কমিশন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী কঠোর হওয়ায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে।

অধ্যায় : চার

নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও নির্বাচন কমিশন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

৪.১ ভূমিকা :

যে কোন গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠনে এ যাবত আবিস্কৃত সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো 'নির্বাচন'। এই নির্বাচনী ব্যবস্থা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে যদি সেটি গণতান্ত্রিক উপায়ে সম্পন্ন হয়; যেখানে সবার মতামতের প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ দল, মত, শ্রেণী ও পেশার মানুষের মতামতের প্রতিফলন ঘটে। এই মতামতের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ও পদ্ধতি নির্বাচন করা সম্ভব। পৃথিবীর আদিকাল থেকেই মতামতের গুরুত্ব বোঝাতে নির্বাচন পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়ে আসছে। মত প্রকাশ করে পছন্দের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বেছে নেয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো নির্বাচন। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ যখন নিজের ভালো লাগা কিংবা মন্দ লাগা অথবা বাছ-বিচার করতে শিখেছে, তখন থেকেই মানুষ মত প্রকাশকেন্দ্রীক আচরণ করতে শিখেছে; এ জন্য বেছে নিয়েছে নির্বাচন পদ্ধতিকে। মানুষের মধ্যে যখন মতের বিভেদ দেখা দিয়েছে, তখন নির্বাচনের আশ্রয় নিয়েছে। তাই বলা যায়, আদিকাল থেকে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতার যুগেও নির্বাচন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে।

৪.২ নির্বাচন :

উইকিপিডিয়া মতে, নির্বাচন হলো–সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ প্রশাসনিক কাজের জন্য একজন প্রতিনিধি বেছে নেয়। সপ্তদশ শতাব্দি থেকে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভার পদ পূরণ করা হয়, কখনো আবার কার্যনির্বাহী ও বিচার ব্যবস্থা ছাড়াও আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধি বাছাই ও নির্বাচনের মাধ্যমেও করা হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেও এই নির্বাচন প্রক্রিয়া আবার প্রয়োগ করা হয়। কর্পোরেশন, ক্লাব, সমিতি আর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি বা নেতা বাছাই করা হয়। আধুনিক গণতন্ত্রে প্রতিনিধি বাছাইয়ের উপায় হিসেবে নির্বাচনের সার্বজনীন ব্যবহার করা হচ্ছে। গণতন্ত্র যেখান থেকে শুরু সেই গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে নির্বাচনকে যেভাবে ব্যবহার করা হতো সে তুলনায় অনেকটাই বিপরীত। নির্বাচনী ব্যবস্থাকে শাসকগোষ্ঠীর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হতো ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বেশিরভাগ দপ্তরই পূরণ করা হতো বাছাই বা সিলেকশনের মাধ্যমে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে অথবা এক রাজনৈতিক দল থেকে অন্য রাজনৈতিক দলের কাছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে হস্তান্তরের কৌশলই হলো নির্বাচন। বাংলায় মধ্যযুগে

হানাহানি আর বিবাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পাল রাজাদের মধ্য থেকে গোপালকে বেছে নিতে নির্বাচনের আশ্রয় নিতে হয়েছিলো; বাংলায় প্রথম নির্বাচনী ব্যবস্থার শুরু এখান থেকেই। **(মজুমদার; ২০১৩)**

৪.৩ নির্বাচনী আইন : নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করতে যে সব ব্যবস্থা, আইনী বিধি-বিধান ও পদ্ধতি রয়েছে সেটি হলো নির্বাচনী আইন। নির্বাচনী আইনের মাধ্যমে একটি বস্তুনিষ্ঠ মতামতের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। নির্বাচনী আইন হলো অ্যাক্ট ও বিধিমালা। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন বেশ কিছু আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। উল্লেখযোগ্য আইনগুলো হলো :

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন :

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৯১

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিধিমালা, ১৯৯১

সংসদীয় নির্বাচন :

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (সর্বশেষ সংশোধনীসহ)

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন), ১৯৭২

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (দ্বিতীয় সংশোধন), ১৯৭২

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (সংশোধন), ২০০৮

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (দ্বিতীয় সংশোধন), ২০০৮

নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮

সংসদীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ বিধিমালা, ২০০৮

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১

সংসদ সদস্য (বিরোধ নিষ্পত্তি) আইন, ১৯৮০

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধনী আইন, ২০০৯

স্থানীয় সরকার নির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন :

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০

সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৮

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা (সংশোধনী), ২০০৮

সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০০৮

সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা (সংশোধীত), ২০০৮

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১০

উপজেলা নির্বাচন :

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৮

উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০০৮

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ এর সংশোধনী

উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৩ এর সংশোধনী

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৩ এর সংশোধনী

পৌরসভা নির্বাচন :

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৯

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০১০

পৌরসভা (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা ২০১০

পৌরসভা নির্বাচন (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা ২০১২

ইউনিয়ন পরিষদ :

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধীত আইন, ২০১০

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০

ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০

সীমানা নির্ধারণ :

সীমানা পুর্ননির্ধারণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬

জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুন:নির্ধারণ ২০১৩

ভোটার তালিকা :

ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০০৮

ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২

ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯

ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন, ২০১০

ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন, ২০১৩

ভোটার তালিকা (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩

অন্যান্য :

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্বাচন আইন, ২০০৪

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন ২০১০

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন ২০১০ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থীতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১

বিদেশি পর্যবেক্ষক নীতিমালা, ২০১৩

স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য (সংশোধীত) নীতিমালা, ২০১৩

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯

৪.৪ নির্বাচনী আইনের প্রকারভেদ :

সমসাময়িক বিশ্বে তিন ধরনের নির্বাচনী ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

১. সরল বহুত্ব ব্যবস্থা,

২. আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা এবং

৩. সংখ্যাগরিষ্ঠভিত্তিক ব্যবস্থা।

বাংলাদেশে ব্রিটিশ ধাঁচের সরল বহুত্ব ব্যবস্থা কম-বেশি অনুসরণ করা হয়। এ ব্যবস্থায় একক সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী বিজয়ী হন এবং গণনা শেষে ভোট পুনর্বন্টনের কোন সুযোগ নেই। এর ফলে সংখ্যালঘিষ্ট ভোট পেয়ে কোনো প্রার্থী বিজয়ী হতে পারেন, যদি তিনি সব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে থাকেন। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, ক্ষুদ্র হয়ে অধিকাংশ ভোটারের অপছন্দ; তবু তিনিই হয়ে যান তাদের প্রতিনিধি। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় নির্বাচনে ভোটদানকারি জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ট দুই অংশেরই প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়। এ ব্যবস্থায় বিরাট আকারে বহু আসন বিশিষ্ট নির্বাচনী এলাকা গঠন করা হয়। ভোটারদের প্রদত্ত মত অনুযায়ী অগ্রাধিকার অনুপাতে আসন বরাদ্দ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এই ব্যবস্থার অধীনে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ৬ আসনবিশিষ্ট একটি বড় নির্বাচনী এলাকায় বিভিন্ন দলের জন্য প্রদত্ত ভোটের সংখ্যার অনুপাতে আসনগুলো ৩:২:১ অনুপাতে ভাগ করে দেয়া হয়। এভাবে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দল পায় ৩টি আসন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত দল পায় ২টি আসন ও তৃতীয় দলটি পায় ১টি আসন। তুলনামূলকভাবে বহুত্ব ব্যবস্থায় যদি কোনো বড় নির্বাচনী এলাকাটি ৬টি আসনে বিভক্ত থাকতো, তবে কেবল সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দলটি একাই ৬টি আসন দখল করে নিতে পারতো। এ কারণেই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় নির্বাচনী এলাকা সব সময় বিরাট হয়ে থাকে। যেমন : ইসরাইলে পুরো দেশটি একটি একক নির্বাচনী এলাকা। বড় আকারের নির্বাচনী এলাকা গঠনের ফলে সংখ্যালঘু নাগরিকের প্রতিনিধি হওয়া সম্ভব। তবে এই ব্যবস্থায় আসন বরাদ্দের ফলে সম্ভাব্য জটিলতা নিরসনের জন্য ভোটের কিছুটা পুনর্বন্টন ও তারপর ভোটারদের দ্বিতীয় পছন্দের বিষয়টি গণনায় আনা যেতে পারে। **(গাইন, ২০০৮)**

সংখ্যাগরিষ্ঠমূলক নির্বাচনী ব্যবস্থায় বিজয়ী হতে হলে প্রার্থীকে সাধারণ ভোটের অধিকাংশ পেতে হয়। সরল বহুত্ব ব্যবস্থার মতো কেবল একক সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট নয়। যদি প্রথম গণনায় কোনো প্রার্থীই এরকম নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পান, তখন দ্বিতীয়বার ভোট প্রদান বা গণনা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় গণনার সময় কম সফল প্রার্থীদের ভোটকে ভোটারদের প্রদত্ত দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হারে পুর্নবন্টন করা হয়। এই ব্যবস্থায় ভোটাররা তাদের দ্বিতীয় পছন্দের বিষয়টি জানিয়ে দেন।

উল্লিখিত সবগুলো ব্যবস্থার খুটিনাটি বিবেচনায় কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। আমাদের দেশে যে ব্যবস্থায় নির্বাচন হয় তা সম্ভবত প্রবর্তিত হয়েছিলো একটি স্পষ্ট ও সামগ্রিক উপায়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রার্থীকে নির্বাচিত করার লক্ষে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা অবিভক্ত ভারতে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলো এবং কিছু ছোট খাটো পরিবর্তন এনে এটি এখনো আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত একটি জনপ্রিয় নির্বাচনী ব্যবস্থা।

১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট আইউব খানের নির্বাচনী ব্যবস্থা ছিলো ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা। মৌলিক গণতন্ত্রীরা ১৯৬২ সালের পাকিস্তানের সংবিধানের আওতায় আইউবের শাসনামলকে বৈধতা দিতে দু'বার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে ভোট দিয়েছেন। তবে ঐ দুটি নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ, মাওলানা ভাসানীর ন্যাপসহ পাকিস্তানের বড় রাজনৈতিক দলগুলো অংশ নেয়নি। ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আইউব খানের ওপর পাকিস্তানের জনগণের আস্থা আছে কিনা তা জানতে 'হ্যাঁ' এবং 'না' ভোট অনুষ্ঠিত হয়। মৌলিক গণতন্ত্রীর শতকরা ৯৫ ভাগ আইউব খানকে 'হ্যাঁ' ভোট দেন। পরে ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট আইউব খান দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচনের আয়োজন করেন। সেবার আইউবের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর বোন ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনে অংশ নেন। তবে এবারও মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে বিজয়ী হন জেনারেল আইউব খান। তার পতনের পর পাকিস্তানে পরোক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায় এবং আগের সর্বজন গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাটি স্বাধীন বাংলাদেশে পুন:প্রবর্তিত হয়। সামরিক শাসনের সময়কাল বাদে বাংলাদেশের প্রায় সব নির্বাচনই সরল বহুত্ব ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। **(খান, ২০১৩)**

৪.৫ নির্বাচনী আইনের গুরুত্ব :

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য The Representation of the People Order, ১৯৭২ (RPO) বিদ্যমান রয়েছে, যা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংক্ষেপে আরপিও) নামে বহুল পরিচিত। The Representation of the People (Amendment) Ordinance 2008, The Representation of the People (Second Amendment) Ordinance ২০০৮ এর মাধ্যমে এ আদেশের দু'টি সংশোধনী আনা হয়েছে। এ আইনের অধীনে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধিমালা, ২০০৮ ও রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ জারি করা হয়েছে। এছাড়া, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮, স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা ২০০৮, উপজেলা পরিষদ (নির্বাচনী আচরণ) বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪.৬ নির্বাচনী আইনের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন :

নির্বাচনী আইন মূলতঃ সারা বছরই মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন হয়। তবে নির্বাচনের আগে ও পরে নির্বাচনী আইনের প্রয়োগটা বেশি হয়। নির্বাচন কমিশন সারাদেশে নির্বাচনী কর্মকর্তা, কর্মচারিদের বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে নির্বাচনী আইন মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে। এজন্য রয়েছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। ঢাকার আগারগাঁওয়ে 'কুশলী ভবনে' নির্বাচনী আইন কানুন ও বিধি-বিধান ইসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে নির্বাচনী আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে তা বাস্তবায়ন করেন।

৪.৭ নির্বাচন কমিশনের কাজ :

নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনকে যেসব কাজ করতে হয় সেগুলো হলো :

- নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ
- নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সঠিক ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রনয়ণ ও
- ভোটার তালিকা সংশোধন
- ভোটগ্রহণ বা নির্বাচন।

উলিণ্ঢখিত এই ৩টি স্তরের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয় সংশ্লিষ্ট আইন এবং এর আওতাধীন প্রণীত বিভিন্ন বিধিমালা সমূহের দ্বারা।

৪.৭.১ নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ :

বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে 'ডিলিমিটেশন কমিশন'। এই কমিশন সব দেশেই সম্পূর্ন স্বাধীন। সৎ, নিষ্ঠাবান ও যোগ্যতম ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয় এই কমিশন, যারা সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করেন। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলার আইনসভার নির্বাচনী এলাকাসমূহের সীমানা নির্ধারণের জন্য পাকিস্তান সরকারও একটি স্বাধীন ডিলিমটেশন কমিটি গঠন করেছিলো। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রনয়ণ, রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন, গণভোট ইত্যাদি অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ছাড়াও নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে দেয়া হয়েছে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কিত গেজেট প্রকাশিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ৩ হাজারেরও বেশি আপত্তি উথাপিত হয়। ১৯৭২ সালের আইন দ্বারা প্রণীত আইন দ্বারা এখনও নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ হচ্ছে। এই আইনে সংক্ষিপ্ত আকারে শুধু বলা হয়েছে যে, নির্বাচন কমিশন দেশের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণকালে প্রতিটি এলাকার :

- প্রশাসনিক সুবিধা

- এলাকার সংহতি ও
- যতটা সম্ভব জনসংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করবে।

১৯৮৪ সাল থেকে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সময়ে সংসদীয় সীমানায় উল্লেখ যোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। ড. এ টি এম শামসুল হুদা কমিশন কম্পিউটারের সহায়তায় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম অর্থাৎ জিপিআরএস জরিপের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের ৩০০ নির্বাচনী আসনের সীমানা পুন:নির্ধারণ করে খসড়া তালিকা প্রকাশ করে। খসড়া তালিকার ওপর প্রাপ্ত দাবি অথবা আপত্তির শুনানি গ্রহণপূর্বক নিস্পত্তি করে ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্তকরা হয়। তবে সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত আদালতের রায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে যায়। যদিও অতীতের নির্বাচন কমিশন জনস্বার্থে উপজেলার সংহতি অক্ষুন্ন রাখার সর্বাত্বক চেষ্টা করেছে। কারণ, কোনো উপজেলাকে দু'ভাগ করে পাশ্ববর্তী দু'টি উপজেলার সঙ্গে যুক্ত করে দু'টি ভিন্ন নির্বাচনী এলাকা তৈরী করলে খন্ডিত উপজেলার দু'টি অংশেই তাদের প্রতিনিধি সংসদে পাঠাতে অসমর্থ হবে। এ কারণেই অতীতে নির্বাচন কমিশন আইনের বিধানমতে প্রশাসনিক সুবিধা এবং সংহতি প্রাধান্য দিয়ে নির্বাচনী এলাকা গঠন করেছে। জনসংখ্যাকে তারা ততটুকুই গুরুত্ব দিয়েছে, যতটুকু দিলে উপজেলার প্রশাসনিক সুবিধা এবং সংহতি অক্ষুন্ন থাকে। কিন্তু ড. এ টি এম শামসুল হুদার কমিশন নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য জনসংখ্যাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, প্রশাসনিক সুবিধাকে নয়। আইনে স্পষ্ট বলা আছে, জনসংখ্যা ততটুকু গুরুত্ব পাবে যতটুকু দেয়া সম্ভব। জনসংখ্যাকে গুরুত্ব দেয়ায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সংসদীয় আসন সংখ্যা ৮ থেকে বেড়ে ১৫টিতে হয়েছে। শুধু তাই নয় কোনো জেলার আসন সংখ্যা কমেছে; আবার কোনো জেলার আসন সংখ্যা বেড়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অর্ধেকের বেশি মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বাইরের জেলা থেকে এসেছে। তাই তাদের মধ্যে ভাসমান বেশি। এ ভাসমান জনগোষ্ঠীকে ঢাকা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে গণ্য করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আসন ৮ থেকে ১৫ করা হয়েছে। এর ফলে, দেশের অধিকাংশ নির্বাচনী এলাকা পুনর্গঠিত হয়। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য কমিশন ইচ্ছা মোতাবেক পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে। প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দেশের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার সীমানা অতীতে অনেকবার নির্ধারণ করা হয়েছে, সীমানা নির্ধারণকালে কমিশন প্রতি ক্ষেত্রেই এলাকার প্রশাসনিক সুবিধা ও সংহতির ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। প্রশাসনিক ইউনিটের মধ্যে আসন বন্টনের ক্ষেত্রে আগে যে নীতিমালা অনুসরণ করা হতো বর্তমানে তা করা হয় না। আগের নীতিমালা অনুসারে সারাদেশের জনসংখ্যাকে মোট ৩০০ আসন দিয়ে ভাগ করে যে সংখ্যাটি পাওয়া যেতো তা সকল নির্বাচনী এলাকার মোট জনসংখ্যার গড় বলে বিবেচনা করা হতো। একে জনসংখ্যার গড় বলা হতো। কমিশন প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগের মোট জনসংখ্যাকে জাতীয় গড় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে এর প্রাপ্য আসন

সংখ্যা নির্ধারণ করতো। সকল ক্ষেত্রেই ভাগফলের সমান সংখ্যক আসন সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দ হতো। যেক্ষেত্রে ভাগশেষ জাতীয় গড় সংখ্যা ৫১ ভাগ হতো অথবা তার বেশি হতো সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে একটি অতিরিক্ত আসন দেয়া হতো। ভাগশেষ জাতীয় গড় সংখ্যার ৫১ ভাগ এর কম হলে কোনো অতিরিক্ত আসন বরাদ্দ হতো না। এভাবে বিভাগগুলোর মধ্যে আগে আসন বন্টন হতো।

৪.৭.২ নির্ভুল ও নতুন ভোটার তালিকা প্রনয়ণ :

ভোটার তালিকা ভোটগ্রহণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভোটার তালিকার কাজ নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের আগে শুরু হলেও সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এর শেষ হয় নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের পর। কারণ, ভোটার তালিকা তৈরী হয় ভোটার এলাকার ভিত্তিতে। পলণ্টী এলাকায় মৌজা বা গ্রাম এবং পৌর এলাকায় পাড়া বা মহল্লা হলো ভোটার এলাকা। নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের পর এলাকাভিত্তিক ভোটার তালিকা নির্বাচনী এলাকা অনুযায়ী সাজিয়ে নেয়া হয়। ভোটার তালিকা প্রনয়ণ সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত হয় ভোটার তালিকা অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধিমালা দ্বারা। অবশ্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। আইন ও বিধি প্রনয়নের আগেই ভোটার তালিকা প্রনয়ণের কাজ শুরু হয়। বর্নিত অধ্যাদেশটি জারি করা হয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের সুপারিশক্রমে। বিধিমালাটি জারি করে নির্বাচন কমিশন। রাষ্ট্রপতির জারি করা অধ্যাদেশ মোতাবেক সারাদেশে যে ভোটার তালিকা তৈরী করা হয়েছে তাতে প্রত্যেক ভোটারের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি কম্পিউটারে ডাটাবেজ আকারে রাখা হয়েছে এবং তালিকাভুক্ত প্রত্যেক ভোটারের নামের বিপরীতে একটি করে ছবি ও তথ্য আছে। এ ব্যবস্থায় জাট ভোট দেয়া বন্ধ হয়েছে। তবে ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে সব নাগরিক ভোটার হয়েছেন কিনা সেই নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব হয় নাই। কারণ যারা শুধু নির্ধারিত ক্যাম্পে গিয়ে ছবি তুলেছেন তারাই ভোটার হয়েছেন। যারা যাননি তারা ভোটার হতে পারেননি। নতুন পদ্ধতিতে প্রণীত ভোটার তালিকায় ভোটার সংখ্যা অনুযায়ী ২০০৭ এর ২২ জানুয়ারি নবম জাতীয় সংসদের যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিলো, তার জন্য প্রণীত ভোটার তালিকার ভোটারের সংখ্যার চেয়ে ১ কোটি ২০ লাখ বেশি। সংবিধানের ১২২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন, যদি তিনি- বাংলাদেশের নাগরিক হন, তার বয়স ১৮ বছরের কম না হন কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃস্থি বলে ঘোষিত না হন এবং যে এলাকায় তিনি নিবন্ধিত হতে চান সেখানকার অধিবাসি বা আইনের দ্বারা অধিবাসী বিবেচিত হন।

১৯৭০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত যে ৭টি ভোটার তালিকা তৈরী করা হয় তার প্রতিটিই ছিলো নতুন ভোটার তালিকা। সে লক্ষ্যে বিচারপতি এম এ আজিজ ২০০৫ সালের ২৩ মে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে শপথ নেওয়ার পর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০০৬ সালে ভোটার তালিকা তৈরীর কাজ শুরু করেন। কিন্তু বিতর্কিত ঐ পদক্ষেপটি সে সময়ে আদালত পর্যন্ত গড়ালে হাইকোর্ট নতুন ভোটার

তালিকা তৈরীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। একই সঙ্গে আদালত নির্বাচন কমিশনকে নতুন ভোটার তালিকা তৈরীর পরিবর্তে নিয়ম অনুযায়ী আগের ভোটার তালিকা হালনাগাদের নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টের ঐ রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের পর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ঐ রায় বহাল রাখলে নির্বাচন কমিশনকে আর ২০০০ সালের ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা ছাড়া কোন উপায় ছিলো না। এতে করে ঐ সময়ে হাতে নেয়া নতুন ভোটার তালিকা তৈরীর প্রকল্পটি বাধাগ্রস্ত হয় ও প্রচুর পরিমাণে আর্থিক ক্ষতি হয়। মার্কিন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা এনডিআই-এর জরিপে দেখা গেছে, ২০০০ সালের ভোটার তালিকায় ৮.৩ শতাংশ ত্রুটিপূর্ণ ভোটার ছিলো। যদিও এই ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা অনুসারেই অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। উচ্চ আদালত ২০০০ সালের ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার নির্দেশ দিলেও ঐ তালিকার আগের ত্রুটি সংশোধনের কথা বলেনি আর নির্বাচন কমিশনও ঐ তালিকার ত্রুটি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়নি।

৪.৭.৩ ভোটার তালিকা সংশোধন :

২০০৭ সালের নির্ধারিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিচারপতি আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে যে নির্বাচন কমিশন কাজ করছিলো তাদের অধীনে যে ভোটার তালিকা করা হয় তাতে দেশব্যাপি সোয়া ১ কোটি ভুয়া ভোটার যোগ হয়। এটিকে ইস্যু বানিয়ে তৎকালীন বিরোধীদল আওয়ামী লীগসহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরী এবং বিচারপতি আজিজের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে দেশ সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে চলে যায়। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে রাজধানী ঢাকায় মহাজোটের কর্মীদের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী ও শিবিরের কর্মীদের প্রকাশ্যে সংঘর্ষে ৫ জন মারা যায়। পরে, ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়। ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর নির্বাচন কমিশনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়। ঐ বছরের ২১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুল আজিজকে চায়ের দাওয়াতের আমন্ত্রণ জানান। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বঙ্গভবনে দেখা করতে গিয়ে তার হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দেন সিইসি আব্দুল আজিজ। পরে ৩১ জানুয়ারি ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মাহফুজুর রহমান, নির্বাচন কমিশনার স ম জাকারিয়া, মো. হাসান মনসুর, মোদাবিক্ষর হোসেন চৌধুরী ও মো. সাইফুল ইসলাম পদত্যাগ করেন।

এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. এটিএম শামসুল হুদাকে ২০০৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেন। এছাড়া, অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার মুহাম্মদ ছহুল হোসাইন ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ড. শামসুল হুদার নেতৃত্বে কমিশন দায়িত্ব নিয়েই নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী আইন ও ভোটার তালিকা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। আইন সংশোধন করে সারাদেশে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজও শুরু করে। ২০০৭ সালের ১০ জুন ছবিযুক্ত ভোটার তালিকার পাইলট প্রকল্প শুরু করে গাজীপুর জেলার

শ্রীপুরে। এর উদ্বোধন করেন সাবেক সিইসি ড. এটিএম শামসুল হুদা, ঐ সময় তার সঙ্গে ছিলেন সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন উ আহমদ। ভোটার তালিকা প্রণয়নের পাশাপাশি জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরীর কাজটিও করতে থাকে নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকার যাবতীয় তথ্য কম্পিউটারে ডাটাবেজ আকারে সংরক্ষণ করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে ভোটার তালিকা সংশোধন বা হালনাগাদের কাজ অনেকটা সহজ হয়। আর এ কারণেই ছবির পাশাপাশি আরো বায়োমেট্রিক্স তথ্য যেমন : ফিঙ্গার প্রিন্ট বা হাতের আঙ্গুলে ছাপ সংগ্রহ করে সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়; যা দিয়ে পরবর্তীতে দেশের সব ভোটারকে জাতীয় পরিচয়পত্র দেয়া হয়। দেশব্যাপী বিশাল এই কাজটি নির্বাচন কমিশন করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে। যে কারণে ভোটার তালিকাটি ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রকল্পের কাজটি বেশ ভালোভাবেই সম্পন্ন করে সুশৃঙ্খল এই বাহিনী। এই প্রকল্পের নাম দেয়া হয় 'ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রকল্প'। এই কাজে বাজেট ধরা হয় ৫৪৬৯৮.৩৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব খাত থেকে আসে ২০২৪৩.২৩ লাখ টাকা আর বাকি ৩৪৪৫৫.১৩ লাখ টাকা দেয় নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থা ইউএনডিপি, ইউরোপিয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের ডিএফআইডি। এ প্রকল্পের আওতায় ভোটার প্রতিটি এলাকার নির্দিষ্ট স্কুল অথবা জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের নির্বাচনী অফিসের ভোটারদের ছবি তোলার মাধ্যমে ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরীর কাজ করা হয়। ২০০৭ সালের ১০ জুন গাজীপুরের শ্রীপুরে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরীর পরীক্ষামূলক পাইলট প্রজেক্ট শুরু হয় আর শেষ হয় ২০১০ সালের জুন মাসে। এই প্রজেক্ট ২০০৭ সালের ২০ অগাস্ট একনেকে পাশ হয় আর একই বছরের ২৯ অগাস্ট বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচন কমিশন ও ইউএনডিপি'র মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিদেশি রাষ্ট্র, ইউরোপিয় ইউনিয়ন ও দাতা সংস্থাগুলো ইউএনডিপি'র মাধ্যমে টাকা ছাড়া দেয় ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রজেক্টের কাজে। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ভোটার সংখ্যা হয় ৮ কোটি ১০ লাখ হাজার ৮৭ হাজার ৩ ভোট।

৪.৭.৪ ভোটার তালিকা হালনাগাদ :

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা আরপিও অনুযায়ী প্রতিবছর ১ জানুয়ারি ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে নির্বাচন কমিশন। আগের ভোটার তালিকায় যারা ভোটার হতে পারেন নাই তাদেরকে ভোটার করা হয় এই হালনাগাদ প্রক্রিয়ায়। এছাড়া, যে সব ভোটার মারা যায় তাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়াও এই প্রক্রিয়ার অংশ। এছাড়া, প্রতি বছর জানুয়ারির আগে যে সব প্রবাসী বিদেশ থেকে দেশে আসেন তাদেরকেও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এই হালনাগাদ ভোটার তালিকায়।

৪.৮ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের করণীয় কাজসমূহ :

ছবিসহ ভোটার তালিকা বনাম জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন

ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার

ছবিসহ ভোটার তালিকার ব্যবহার

ভোটকেন্দ্রে ভোটারের তথ্য সরবরাহ করা

নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা

রিটার্নিং অফিসার ও সহকারি রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ

রিটার্নিং অফিসার ও সহকারি রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব বন্টন

নির্বাচনের সময়সূচি সম্পর্কিত গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা

মনোনয়নপত্র গ্রহণ

জামানত

মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ ঘোষণা

সহকারি রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র

মনোনয়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ

মনোনয়নপত্র বাছাই

বাছাইয়ের সময় বিবেচ্য বিষয়

সারবত্তাহীন ত্রুটির জন্য মনোনয়নপত্র বাতিল না করা

বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ

আপিল

বৈধ মনোনয়ন প্রার্থীর তালিকা সংশোধন

প্রার্থীতা প্রত্যাহার

প্রার্থীর মৃত্যু

নির্বাচনী কার্যক্রম মুলতবি করা

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ

ভোটগ্রহণের দিন ও সময় নির্ধারণ করা

ভোটকেন্দ্র স্থাপন

ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা

ভোটকেন্দ্র স্থাপনের জন্য নীতিমালা করা

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বের ভোটকেন্দ্র বহাল রাখা

বিলুপ্তির কারণে আলোচনার ভিত্তিতে নতুন কেন্দ্র নির্ধারণ

পাবলিক বিল্ডিংয়ে ভোটকেন্দ্র স্থাপন

সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন স্থানে কেন্দ্র না করা

ভোটার অনুসারে কেন্দ্র ও কক্ষ স্থাপন

অতিরিক্ত ভোটকক্ষের ব্যবস্থা করা

বিশেষ করে কম সংখ্যক ভোটার নিয়ে কেন্দ্র স্থাপন

যাতায়াতের সুবিধা ও অবস্থান

সহকারি রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের সহযোগিতা করা

রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র না করা

প্রতিষ্ঠানের নাম অনুসারে ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা

অস্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করা

একাধিক কেন্দ্র স্থাপনে মূল প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করা

পুরুষ ও মহিলাদের সুশৃঙ্খলভাবে ভোট দেওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা

শহর এলাকায় পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য আলাদা ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা

তালিকায় পুরুষ ও মহিলা ভোটারের উল্লেখ করা

ভোটার এলাকার নাম ও সংখ্যা উল্লেখ করা

বিভিন্ন ভোটার এলাকার ভোটার নম্বর উল্লেখ করা

বেশি সংখ্যায় ভোটার এলাকাকে প্রাধান্য দেয়া

প্রতিবন্ধি, বয়স্ক ও মহিলা ভোটারদের সুবিধা দেয়া

প্রাপ্ত আপত্তি ও সুপারিশ যাচাই করা

নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা

ভোটকেন্দ্র ও তালিকা চূড়ান্তকরণ

ভোটকেন্দ্রের তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করা

৪.৮.১ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ :

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় ব্যক্তিকে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত না করা

তালিকা সংগ্রহ

প্যানেল প্রস্তুতের লক্ষ্যে তালিকা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেয়া

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া

অন্যান্য কাজে দায়িত্ব পালনকারিদের তালিকা তৈরী করা

৪.৮.২ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য :

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা করা

প্রার্থীর অধীনে চাকুরিরত কর্মকর্তার নিয়োগ নিষিদ্ধ করা

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগে বিশেষ যোগ্যতা

মহিলা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা তৈরী করা

প্রিসাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণ করা

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের পরিচয়পত্র তৈরী করা

৪.৮.৩ প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারণ :

জাতীয় সংসদের প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ধারণ করা

৪.৮.৪ হলফনামা ও ব্যক্তিগত তথ্যাদির প্রচার করা :

হলফনামায় দাখিল করা তথ্যাবলী ভোটারদের মধ্যে প্রচার করা

হলফনামায় ভুল তথ্য প্রদানকারিদের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া

৪.৮.৫ প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া:

রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করা

জোটভুক্ত দলের প্রতীক বরাদ্দ করা

স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতীক বরাদ্দ করা

প্রার্থীকে প্রতীকের নমুনা প্রদান

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকায় প্রতীক সন্নিবেশ করা

উপরের কাহাকেও নহে বা 'না' ভোটের বিধান রাখা

৪.৮.৬ নির্বাচনী ব্যয় ও উৎসের বিবরণী তুলে ধরা :

নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী দাখিল করা

সম্পদ ও দায় এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল করা

নির্বাচন কমিশনে বিবরণী পাঠানো

সম্পূরক বিবরণী

যথাযথভাবে বিবরণী দাখিলের জন্য নির্দেশনা দেয়া

প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়

নির্বাচনী প্রতীক ও পোস্টারের আকার নির্ধারণ

নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা

নির্বাচনী ব্যয়ের বিষয়বস্তু

নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল

নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত বিধানাবলী লঙ্ঘনের অপরাধ ও শাস্তি

নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা অতিক্রম

সম্ভাব্য ব্যয়ের উৎসসহ বিভিন্ন বিবরণী ও রিটার্ন জমা না দেওয়া বা এ সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তির বিধান

নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব ও বিবরণী দাখিলে ফর্ম

নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিধান অবহিতকরণ

নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী সংক্রান্ত দলিলপত্র সংরক্ষণ

ব্যয় বিবরণী সংক্রান্ত দলিলপত্র পরিদর্শন ও কপি প্রদান

৪.৮.৭ পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেয়া :

পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান

পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের জন্য আবেদন

আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর করণীয়

ভোটারের কাছে পাঠানো দ্রব্যাদি

ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি যথাযথস্থানে সংরক্ষণ

ব্যালট পেপারে ভোট দেওয়া

নিরক্ষর বা অসমর্থ ভোটারকে সহায়তা প্রদান

পোস্টাল ব্যালট পেপার পুন:সরবরাহ করা

পোস্টাল ব্যালট পেপার ফেরত দেওয়া

পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রাপ্তি এবং রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধকরণ

৪.৮.৮ ভোটদান প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি :

ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা

ভোটকেন্দ্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখা

ভোটকেন্দ্র হতে বহিস্কার

ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার

ভোটকেন্দ্রে ভোটের জন্য প্রচার নিষিদ্ধ

বিধান লঙ্ঘনের শাস্তি

ভোটগ্রহণ প্রস্তুতি

পরিপূর্ণ ব্যালট বাক্স সংরক্ষণ ও অন্য বাক্স ব্যবহার

ভোটদান পদ্ধতি

ভোট কেন্দ্রে অযথা দেরি না করা

অন্ধ বা অক্ষম ভোটারের ভোটদান

ভোটগ্রহণের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভোট না দেওয়া

আপত্তিকৃত ভোট

আপত্তিকৃত ভোটের প্যাকেট

টেন্ডার্ড ভোট

আপত্তিকৃত ভোট বাবদ ফি আদায়

ভোটকক্ষে পর্যবেক্ষকদের অবস্থান

জাল ভোটদান দণ্ডনীয় অপরাধ

নষ্ট ও বাতিল হওয়া ব্যালট পেপার

ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা

মুড়িপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ

ব্যালট পেপার সরবরাহ ও যাচাইকরণ

ব্যালট পেপারসহ বিভিন্ন ধরনের সিলের সংরক্ষণ ও গোপনীয়তা রক্ষা

৪.৮.৯ নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্ট :

নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ

পোলিং এজেন্ট নিয়োগ

নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের অনুপস্থিতি

৪.৮.১০ নির্বাচনী দ্রব্যাদির ব্যবহার :

মনোনয়নপত্র দাখিল হতে প্রত্যাহার পর্যন্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্ধারিত ফর্ম

পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান সংক্রান্ত ফর্ম

ফলাফল একত্রীকরণ ও ফলাফল ঘোষণার সময় ব্যবহৃত ফর্ম

ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি

ভোট কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় যে সকল আসবাবপত্র রাখতে হবে

অন্যান্য ফর্ম ও দ্রব্যাদি ব্যবহার

ব্যালট পেপারসহ অন্যান্য মালামাল যাচাই করে গ্রহণ

অন্যান্য ব্যবস্থা

৪.৮.১১ ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা:

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা

ভোটগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ

ভোটার তালিকা

স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স

নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

ভোটগ্রহণকারী দলের সদস্যদের ভোট কেন্দ্রে অবস্থান ও খাবারের ব্যবস্থা

ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের খাবারের ব্যবস্থা

৪.৮.১২ ভোটগণনা :

ব্যালট পেপারপূর্ণ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স খোলা

ব্যালট পেপার আলাদা আলাদাভাবে সজ্জিতকরণ

ব্যালট পেপার গণনার পদ্ধতি

বাতিলকৃত ভোট অর্থাৎ যে সকল ভোট গণনা করা যাবে না

ভোট পুন:গণনা

ভোট গণনার ফলাফল সম্বলিত বিবরণী প্রস্তুতকরণ

ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণ

ভোট গণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণীতে এজেন্টের স্বাক্ষর নেওয়া

ভোট গণনার বিবরণী প্রদান

নির্বাচনী কাগজপত্রাদি বিভিন্ন প্যাকেটে রাখার পদ্ধতি

ভোট গণনার ফলাফল বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণীর অতিরিক্ত কপি করা

নির্বাচনী কাগজপত্রাদি রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠানো

৪.৮.১৩ প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল সংগ্রহ :

প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল

ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রে উপস্থিতি

ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রের মাধ্যমে ফলাফল গ্রহণ

বেসরকারি ফলাফল পাঠানো

৪.৮.১৪ ফলাফল একত্রীকরণ :

রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণ

সম সংখ্যক ভোট পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া

ভোট পুন:গণনা

সংখ্যাগরিষ্ঠ না ভোট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পুন:ভোটগ্রহণ

ফলাফল একত্রীকণের পর পুন: সীলগালাকরণ

ফলাফল একত্রীকরণের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া

৪.৮.১৫ নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা ও প্রকাশ :

নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা

একত্রীকরণের বিবরণী ও নির্বাচনী রিটার্ন প্রেরণ

রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সত্যয়িত অনুলিপি সরবরাহ

নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ

৪.৮.১৬ নির্বাচনী সংক্রান্ত সরকারি অর্থব্যয়ের সমন্বয় সাধন :

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক নির্বাচনী অর্থ বরাদ্দ

বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয় সাধন

নির্বাচনী অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে প্রিসাইডিং অফিসারদের দায়িত্ব

নির্বাচনী অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব

নির্বাচনী অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে সমন্বয়ের প্রত্যয়ন সংগ্রহ

নির্বাচনী অর্থ ব্যয়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব

সরকারি অর্থের যথাযথ হিসাব দাখিলকরণ

৪.৮.১৭ নির্বাচনী কাগজপত্র সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ :

নির্বাচনী কাগজপত্র সংরক্ষণ

নির্বাচনী কাগজপত্রের ব্যবস্থাপনা

নির্বাচনী দলিল সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও অনুলিপি প্রদান

কোর্ট ফি স্ট্যাম্প সংযোজন

প্রাপ্ত অর্থ জমাদান

৪.৮.১৮ নির্বাচনী অপরাধ, দণ্ড ও প্রয়োগ পদ্ধতি :

নির্বাচনী অপরাধ রোধ ও দণ্ড প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ

দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের শাস্তি দেওয়া

বেআইনী আচরণের শাস্তি

ঘুষ নেওয়া ও দেয়ার শাস্তি

অন্যের নাম ধারণের শাস্তি

অবৈধ প্রভাব বিস্তারের শাস্তি

ভোটগ্রহণ শুরুর আগে ও পরে সভা, মিছিল ইত্যাদি অনুষ্ঠানের শাস্তি

ভোটকেন্দ্রের চৌহদ্দির মধ্যে ক্যানভাস, ভোট প্রার্থণা ইত্যাদি ও শাস্তি

ভোটগ্রহণের দিনে মাইক্রোফোন, লাউড স্পিকার ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহারের শাস্তি

ব্যালট পেপাপরসহ নির্বাচনী কাগজপত্র নষ্ট বা বিকৃত করার শাস্তি

ভোট প্রদানে প্রতিবন্ধকতার শাস্তি

ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতার শাস্তি

ভোট প্রদানে বা বিরত রাখতে কর্মকর্তাদের শাস্তি

সরকারি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার শাস্তি

সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহারের শাস্তি

আইন প্রয়োগকারীর সদস্য কর্তৃক গ্রেফতারের ক্ষমতা

পোস্টার, তোর ন ইত্যাদি অপসারণ

অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ

কতিপয় ব্যক্তির ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা প্রয়োগ

৪.৮.১৯ নির্বাচনী বিরোধ :

নির্বাচনী দরখাস্ত হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল

নির্বাচনী দরখাস্তের আবশ্যকীয় পক্ষ

নির্বাচনী দরখাস্তের আবশ্যকীয় উপাদান

নির্বাচনী দরখাস্ত নিষ্পত্তি

নির্বাচনী দরখাস্ত খারিজের কারণ

নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারকালে সাক্ষ্য প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা

নির্বাচনী প্রার্থীর নির্বাচনের বিরুদ্ধে অন্য প্রার্থীর দাবি

নির্বাচনী দরখাস্তের নিষ্পত্তি আদেশ ও আপিল

নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিলের কারণসমূহ

দরখাস্তকারীর বা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা

ফলাফল প্রভাবিত হবার কারণে সম্পূর্ণ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা

নির্বাচনী দরখাস্তের শেষে নতুন ভোটগ্রহণ

হাইকোর্টে বিভাগের সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তসার নির্বাচন কমিশনকে অবহিতকরণ

নির্বাচনী দরখাস্ত বাতিল

একতরফা নিষ্পত্তি

হাজিরা দিতে ব্যর্থতার কারণে নির্বাচনী দরখাস্ত বাতিল

কতিপয় ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের খরচের আদেশ দানের ক্ষমতা

৪.৮.২০ নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব :

নির্বাচন কমিশনের কর্মচারি

নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা

নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ

নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্তকর্তাদের বদলি না করা

কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনের নির্বাচনী কার্যক্রম উহ্য করার ক্ষমতা

প্রার্থীতা বাতিলে কমিশনের ক্ষমতা

সকল প্রকার প্রভাবের উর্দ্ধে থেকে নিরপেক্ষভাবে কার্যসম্পাদন

সরকার, নির্বাচন কমিশন ও কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা বা কার্যক্রম গ্রহণে বাধা নিষেধ

নির্বাচন কমিশন এবং কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতে প্রশ্ন উত্থাপনে বাধা নিষেধ

৪.৮.২১ বিবিধ :

নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম রোধ

ইলেকটোরাল এনকোয়ারি কমিটি গঠন

ইলেকটোরাল এনকোয়ারি কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইলেকটোরাল এনকোয়ারি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষকের পরিচয়পত্র

নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পর্যবেক্ষক

গাড়ি অধিয়াচন

কতিপয় ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা

ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন

ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম কতৃক সরেজমিনে পরির্দশন ও প্রতিবেদন দাখিল

আচরণবিধিমালা অবহিতকরণ

নির্বাচন মনিটরিং টিম গঠন

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি সেল গঠন

সকল প্রকার ভোটারদের বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের ভোট প্রদান নিশ্চিতকরণ

গৃহীত ব্যবস্থাদি নির্বাচন কমিশনকে অবহিতকরণ

কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ

৪.৯ মাঠ প্রশাসনঃ

মাঠ প্রশাসন হলো–নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনার সঙ্গে জড়িত প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর। মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন দিক সামাল দিতে আছে আইন কানুন ও অধ্যাদেশ। নির্বাচন পদ্ধতির ওপর স্থানীয় প্রশাসনের অপরিমেয় প্রভাব পড়ে। নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন প্রশাসনের সাহায্য চায়। জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসন-এই তিনটি প্রতিষ্ঠানই নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় হিসেবে পরিচালিত হয়। রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনের আগে প্রিসাইডিং অফিসারদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন, যারা ভোটের সময় একটি কেন্দ্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

৪.১০ নির্বাচনী আইন বাস্তবায়নকারি কর্মকর্তারা :

বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে নির্বাচনী আইন বাস্তবায়ন করে থাকেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা। জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইসি'র নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনী আইন বাস্তবায়ন করে থাকেন। নির্বাচনের ঠিক আগে ও পরে যে সব কর্মকর্তারা আইন বাস্তবায়ন করে জাতিকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেন তারাই নির্বাচনী কর্মকর্তা। নির্বাচনী আইন বাস্তবায়ন কারিরা হলেন :

- রিটার্নিং অফিসার
- সহকারি রিটার্নিং অফিসার
- প্রিসাইডিং অফিসার
- সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার ও
- পোলিং অফিসার।

৪.১০.১ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণঃ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

৪.১০.২ রিটার্নিং ও সহকারি রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ :

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের জন্য এক বা একাধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারেন। রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচনী কাজে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারি রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের ওপর অর্পিত। তবে একজন সহকারি রিটার্নিং অফিসারকে একের বেশি নির্বাচনী এলাকার জন্য নিয়োগ করা যায়না। গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসার, সহকারি রিটার্নিং অফিসারের

এলাকা নির্ধারণ করা হয়। সময়সূচি জারির পর রিটার্নিং অফিসার ও সহকারি রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

৪.১০.৩ রিটার্নিং ও সহকারি রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব :

নির্বাচন পরিচালনার কেন্দ্র বিন্দু হলো রিটার্নিং অফিসার। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন জেলা প্রশাসককে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়। আইন ও বিধি অনুযায়ী যথাযথভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব রিটার্নিং অফিসারের। তাছাড়া, সহকারি রিটার্নিং অফিসারগণও রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। রিটার্নিং অফিসারের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলী যেমন ব্যাপক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন পরিচালনার জন্য নানা স্পর্শকাতর এবং সমস্যা সংকূল পরিস্থিতির মধ্যে রিটার্নিং অফিসারকে কর্তব্যে অটল ও অবিচল থেকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ জন্য সংশ্লিষ্ট আইনী দিকগুলো তার ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। আইনের প্রয়োগে রিটার্নিং অফিসারের সামান্যতম ভুল হলে যে কোন নির্বাচনের সামগ্রিক বিষয়টি মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার ক্ষতিগ্রস্ত প্রার্থীর পক্ষে তাৎক্ষণিক কোন মীমাংসার পথ থাকেনা এবং নির্বাচন শেষে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর অধিকার আদায়ের জন্য তাকে আদালতের শরনাপন্ন হতে হয়। রিটার্নিং অফিসার ও সহকারি রিটার্নিং অফিসারগণের নির্বাচন পরিচালনার সুবিধার্থে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ও অন্যনান্য আইন বিধিমালার আলোকে নির্বাচনী ম্যানুয়াল তৈরী করা হয়। ম্যানুয়ালে নির্বাচনী সময়সূচি ও রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, গণবিজ্ঞপ্তি, মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই, ভোটকেন্দ্র স্থাপন, প্রার্থীতা প্রত্যাহার, প্রতীক বরাদ্দ, নির্বাচনী মালামাল সরবরাহ, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, নির্বাচনী মালামালের ব্যবহার, প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব, ভোটগ্রহণ পদ্ধতি, ভোট গণনা, নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নিং দাখিল, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা, নির্বাচনী দলিলপত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়। ম্যানুয়ালের সাথে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮, নির্বাচনী আচরণবিধিমালা ২০০৮, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৮ এবং নির্বাচনী কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন সংযুক্ত করা হয়। তাছাড়া, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা, policy and guidelines for foreign observers ও সংযোজন করা হয়।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, দায়িত্বের বিধানাবলী রিটার্নিং অফিসার আইন ও বিধিমালা অনুসারে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে যেরুপ কার্যাবলী সম্পাদন করা প্রয়োজন তা সম্পাদন ও পালন করে। নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণে থেকে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট জেলার সব নির্বাচনী কাজের তদারকি করে ও নির্বাচন কমিশন যেভাবে আদেশ বা

নির্দেশ জারি করে তা যথাযথভাবে পালন করে। রিটার্নিং অফিসার ও সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিম্নরুপ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে :

- সহকারি রিটার্নিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেন এবং নির্বাচন কমিশনের শর্ত অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থেকে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন।
- কোন ভোটারের ভোটদানের সময় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোটগ্রহণে বাধা দেয়া কিংবা ভোট দিতে বিরত করা বা বাধা দেয়ার চেষ্টা করা অথবা যে কোন উপায়ে ভোটগ্রহণকারি সদস্য বা কোন ভোটারের ওপর প্রভাব বিস্তার করা অথবা কোন প্রকারে ভোটগ্রহণকারি সদস্য বা কোন ভোটারের ওপর প্রভাব বিস্তার করা অথবা কোন প্রকার কাজ যা নির্বাচনী ফলাফলে প্রভাব বিস্তার করে এমন কার্যকলাপের দায়ে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করে যে কোন সময় নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তাকে অথবা জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিতকর্মী অথবা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যকে কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহার করতে পারেন এবং এমন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কমিশন বিবেচনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে দরকারি ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করতে পারে :

কমিশন অনুরুপ কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার যে সব সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন তা হলো :

১. যদি অনুরুপ কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি কোন ভোট কেন্দ্রে বা নির্বাচনী এলাকায় কর্মরত থাকেন তা হলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ভোটকেন্দ্র বা নির্বাচনী এলাকা ত্যাগ করে চলে যেতে নির্দেশ দিতে পারেন।

২. কোন নির্দেশের ক্ষেত্রে, নির্দেশে উলিণ্ঢখিত সময়ের জন্য এমন কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে নির্বাচনী এলাকার বাইরে থাকার জন্য নির্দেশ দেবেন এবং সে অনুযায়ী তিনি নির্দেশ মান্য করবেন এবং যদি তাকে কেবলমাত্র ঐ নির্বাচনী এলাকায় কোন সরকারি দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে তার নিয়োগকারি কর্তৃপক্ষ ছুটি বা অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করবেন।

৩. অনুরুপ কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি সম্পর্কে শাস্তিমূলক বা অন্য কোন ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি পাঠাবেন। কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে প্রত্যাহার করা হলে নির্বাচন কমিশন উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন।

৪.১০.৪ প্রিসাইডিং অফিসার ও সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার :

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৯ অনুচ্ছেদের ১(বি) দফা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিসাইডিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ দেয়ার বিধান আছে। উলিণ্ঢখিত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্যানেল প্রস্তুতের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন অফিস, প্রতিষ্ঠান হতে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের তালিকা সংগ্রহ করতে হয়। একটি ভোটকেন্দ্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারি হলেন প্রিসাইডিং অফিসার। আর প্রতিটি ভোট কক্ষের জন্য থাকেন একজন করে সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার। ভোটগ্রহণ ও গননা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজে প্রিসাইডিং অফিসারের কর্তৃত্ব থাকে। আর ভোটগ্রহণ শেষে প্রিসাইডিং অফিসার ঐ কেন্দ্রের নির্বাচনের খবরা-খবর একটি ফর্মের মাধ্যমে পূরণ করে রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দেন।

৪.১০.৫ ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের অবস্থান :

নির্বাচনে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ১ জন করে প্রিসাইডিং অফিসার দায়িত্বে থাকেন, তাকে সহায়তার জন্য থাকেন সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার। কেন্দ্রের ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করেন প্রিসাইডিং অফিসার। ১ জন করে সহকারি রিটার্নিং অফিসারও প্রতিটি কেন্দ্রে থাকেন। প্রতিটি বুথে প্রত্যেক প্রার্থীর ১ জন করে পোলিং এজেন্ট থাকেন। পোলিং এজেন্টরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে অফিসিয়ালি কাজ করেন। প্রতিটি কেন্দ্রে ১ জন সাব ইন্সপেক্টর থাকেন। একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন যার কাজ হলো কেন্দ্রের ৪০০ গজের ভেতরে কাউকে আসতে না দেয়া। আরো দায়িত্বে থাকেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভাম্যমাণ আদালত হিসেবে কাজ করে থাকেন। ভাম্যমাণ আদালতের প্রতিটি টিমে ৩ জন করে থাকেন, যারা ৩ থেকে ৫টি কেন্দ্রের নির্বাচনী আচরণবিধি লজ্ঞন হলো কিনা তা পর্যবেক্ষণ করেন। আর দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক নির্বাচনী কেন্দ্রে অবস্থান করেন যারা নির্বাচনের খবর সংগ্রহ করেন। এছাড়া, আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় র‌্যাব, পুলিশ ও আনসারের সদস্যরা অবস্থান করেন।

৪.১০.৬ পোলিং অফিসার :

সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত অথবা আধা স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি, সরকারি অথবা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ অথবা সমমানের মাদ্রাসার কর্মচারি, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক বীমা, কর্পোরেশন অথবা অনুরুপ কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি, সরকার অথবা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয় অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয় অথবা সমমানের মাদ্রাসার শিক্ষক অথবা কর্মচারিরা জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে পোলিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৪.১০.৭ মহিলা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ :

মহিলা ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য নির্বাচনের সময় মহিলা সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার ও মহিলা পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হয়। মহিলা ভোটাররা যাতে স্বাচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন তার সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভোটকক্ষের ব্যবস্থা করে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় নির্বাচনে।

৪.১১ নির্বাচনী আইন সংস্কারের উদ্যোগ :

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা জারির পর থেকে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের আগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় নির্বাচনী আইন পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জন হয়েছে। একটি অবাধ, শান্তিপূর্ণও সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ড. এ টি এম শামসুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন কাজ করেছে। তারা নির্বাচনী আইনের নানা অসঙ্গতি দূর করে যুগপোযুগি ও অর্থবহ করতে নির্বাচনী আইনের সংস্কারর উদ্যোগ নেয়। নির্বাচন কমিশন এ জন্য ২ মাস ধরে কাজ করে আইন প্রনয়ণের জন্য। ২০০৭ সালের ৫ এপ্রিল নির্বাচনী আইনের সংস্কার বিষয়ে নির্বাচন কমিশন খসড়া সুপারিশমালা প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন থেকে জানানো হয় যে, ইসি জুলাই মাসের মধ্যে সরকার, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক দল ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে সংলাপের আয়োজন করবে। খসড়া নির্বাচনী আইনের সুপারিশমালা তৎকালীন আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মঈনুল ইসলামকে দেয়া হয়। কমিশন প্রথমে সুশীল সমাজের সঙ্গে খসড়া আইন নিয়ে মতবিনিময়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরে ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে নির্বাচন কমিশন ১৫টি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে খসড়া সুপারিশমালা নিয়ে সংলাপের কথা ঘোষণা করে।

৪.১২ রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন :

ড. শামসুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে। এর আগে অধিকাংশ প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যমের সিনিয়র সাংবাদিক, সম্পাদক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, আরপিও ১৯৭২ সংশোধন করে। নিবন্ধনের শর্তপূরণ করা ৩৯টি রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন দেয় নির্বাচন কমিশন; যার মধ্যে ৩৮টি রাজনৈতিক দল নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনের পরে ৩৯টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্য থেকে ফ্রিডম পার্টি'র নিবন্ধন বাতিল করে ড. শামসুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন।

৪.১৩ সিনিয়র সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের সঙ্গে আলোচনা :

নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপের আগে নির্বাচনী আইনের খসড়া সুপারিশমালা নিয়ে ২০০৭ সালের ২৬ এপ্রিল ও ১৯ মে গণমাধ্যমের সিনিয়র সাংবাদিক, সম্পাদক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে। বৈঠকে প্রতিনিধিরা প্রস্তাবিত নির্বাচনী আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে খোলামেলা বক্তব্য ও মন্তব্য দেয়। নির্বাচন কমিশনও আলোচকদের প্রস্তাবগুলো আক্ষরিক অর্থে আমলে নেয়। পরে নির্বাচনী আইনের চূড়ান্তসংস্কারে সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দেয়া মূল্যবান পরামর্শ ও সুপারিশগুলো আইনের মধ্যে সন্নিবেশ করে।

৪.১৪ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ :

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সবার অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনী আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয় ড. এ টি এম শামসুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন। আর যাদের জন্য সব'চে দরকারি সেই রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসার তাগিদ অনুভব করে কমিশন। ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে সব রাজনৈতিক দল নূন্যতম আসন পেয়েছে কিংবা যে কোন নির্বাচনে শতকরা ২ ভাগ ভোট পেয়েছে এমন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশন সংলাপের সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যে ১৫টি রাজনৈতিক দলকে সংলাপের জন্য বেছে নেয় কমিশন। কিন্তু ঘরোয়া রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় সংলাপ শুরু করা যাচ্ছিলোনা। সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট বেশ ক'টি কিংস পার্টি ও সংগঠনের সৃষ্টি হয় ঐ জরুরি অবস্থার মধ্যে। এসব দল ও সংগঠনগুলো হলো : ড. ফেরদৌস আহমেদ কোরেশির নেতৃত্বাধীন প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক পার্টি-পিডিপি, মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিমের কল্যাণ পার্টি, শওকত হোসেন নীলুর এনপিপি এবং দেশে জরুরি অবস্থা জারিকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদের সমর্থনপুষ্ট 'জাগো বাংলাদেশ' ইত্যাদি। উলিণ্ডখিত দল ও সংগঠনগুলো অবশ্য নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নিয়মিতভাবে নানা ধরনের কর্মসূচি ও মিটিং করে যাচ্ছিলো। আর বড় রাজনৈতিক দলগুলো এই সুযোগে নির্বাচন কমিশনকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় ঘরোয়া রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা না উঠালে তারা কমিশনের সঙ্গে সংলাপে বসবে না। পরে বাধ্য হয়ে ৮ সেপ্টেম্বর শুধুমাত্র রাজধানীতে শর্তসাপেক্ষে সীমিত পরিসরে ঘরোয়া রাজনীতি চালুর উদ্যোগ নেয় তত্ত্বাবধায়ক সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

৪.১৫ রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার :

ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর নির্বাচন কমিশন ২০০৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচনী আইনের সংস্কার বিষয়ে সংলাপের ব্যাপারে চূড়ান্তসিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সীমিত আকারে চালু করা ঘরোয়া রাজনীতির ওপর ১১টি শর্ত আরোপ করে একটি গেজেট প্রকাশ করে। শুধু তাই নয় রাজনৈতিক দলগুলো ঐ শর্ত ভাঙলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার কথা উল্লেখ করে। ঐ সময় আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল ইসলাম জানান, ''ঘরোয়া রাজনীতি চালু করা হয়েছে রাজনীতিবিদদের পরীক্ষা করার জন্য। এখন রাজনীতিবিদরা জনগণের কাছে পরীক্ষা দেবেন তারা কতটা সঠিক, গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল রাজনীতি করেন।'' সরকারের দেয়া গেজেটে অন্তর্ভূক্ত ঘরোয়া রাজনীতির ওপর আরোপিত শর্তগুলো ছিলো নিম্নরুপ :

১. রাজনৈতিক দলের সভা কেবল ঢাকা মহানগর এলাকায় হবে।

২. কোন রাজনৈতিক দলের সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দলের পক্ষ থেকে সভা শুরু অন্তত ২৪ ঘন্টা আগে ডিএমপি কমিশনারকে অবহিত করতে হবে।

৩. সভায় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের অনুর্দ্ধ ৫০ জন সদস্য অংশ নিতে পারবেন। এর বেশি হলে সভা শুরুর ৪৮ ঘন্টা আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে।

৪. সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অথবা ঢাকা মহানগর এলাকায় অবস্থিত ঐ দলের কোন সদস্যের বাসভবন, কমিউনিটি সেন্টার বা হোটেল রেস্তরার ভেতরে ঘরোয়া পরিবেশে সভা অনুষ্ঠান করা যাবে।

৫. উন্মুক্ত স্থানে সামিয়ানা টানিয়ে অনুরুপ সভা অনুষ্ঠান করা যাবেনা।

৬. সভায় কোন দলীয় সাংগঠনিক এবং জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়া, অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবেনা।

৭. সভায় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সদস্য ছাড়া অন্য কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবেনা।

৮. সভায় প্রচার মাধ্যমের কর্মীরা কেবল সংবাদ সংগ্রহের জন্য উপস্থিত থাকতে পারবেন।

৯. সভার কার্যক্রম কোন ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমে সরাসির প্রচার করা যাবেনা।

১০. তবে সভার সংবাদ বা সংবাদচিত্র নিয়মিত সংবাদের অংশ হিসেবে সম্প্রচার করা যাবে।

১১. সভায় এমন কোন শব্দযন্ত্র ব্যবহার করা যাবেনা, যার দ্বারা সভার আলোচনা কার্যক্রম সভাস্থলের বাইরে সাধারণ জনগণের শ্রবণযোগ্য হয়।

৪.১৬ সংলাপের পরিকল্পনা :

নির্বাচনী আইনের সংস্কার প্রস্তাবের খসড়ার ওপর সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদল এবং গণমাধ্যমের সিনিয়র সাংবাদিক ও সম্পাদকদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন ২০০৭ সালের ২৬ এপ্রিল ও ১৯ মে তারিখে বৈঠক করে। এই দুটি আলোচনার পর নির্বাচনী আইনের সংস্কার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত জানতে নির্বাচন কমিশন সংলাপের পরিকল্পনা করে। কিন্তু সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ঘরোয়া রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় কমিশন দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসতে পারছিলো না। ফলে, নির্বাচন কমিশনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সরকার ঢাকা শহরে সীমিত পর্যাযে শর্ত সাপেক্ষে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয়। এই সুযোগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসে কমিশন। সংলাপে কোন কোন রাজনৈতিক দলগুলোকে আমন্ত্রন জানানো হবে এবং কি কি বিষয়ে আলোচনা হবে সে সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা নেয় নির্বাচন কমিশন। পরিকল্পনা অনুযায়ী সংলাপের জন্য একটি মানদণ্ড ঠিক করে প্রতিষ্ঠানটি। ফলে শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোকেই সংলাপে ডাকা হবে এমন পরিকল্পনা নেয়া হয়। আর বাংলা বর্ণের ক্রমানুসারে রাজনৈতিক দলগুলোকে আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা নেয় নির্বাচন কমিশন। নিবন্ধনের যেসব শর্ত ঠিক করা হয় তা হলো :

- ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০১ সালের নির্বাচন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৮টি সংসদ নির্বাচনের যে কোন ১টিতে ন্যূনতম ১টি আসন লাভ অথবা
- ঐ নির্বাচনগুলোর যে কোন একটিতে প্রদত্ত মোট ভোটের ২ শতাংশ অর্জন অথবা
- দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ একটি সক্রিয় সদর দপ্তর এবং জেলা পর্যায়ে কমপক্ষে অর্ধেক জেলায় জেলা ও উপজেলা কমিটি থাকতে হবে।

সংলাপের জন্য আমিন্ত্রত দলগুলো হলো :

১. ইসলামী ঐক্যজোট
২. কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ
৩. গণতন্ত্রী পার্টি
৪. জাতীয় পার্টি (এরশাদ)
৫. জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)
৬. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ (ইনু)
৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ (রব)
৮. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৯. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর)

১০. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

১১. বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন)

১২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল, বিএনপি

১৩. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, সিপিবি

১৪. বাংলাদেশের সাম্যবাদি দল (এমএল)।

পরে তালিকার বাইরে বিকল্পধারা বাংলাদেশ ও লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি'র সঙ্গে সংলাপ করে নির্বাচন কমিশন।

৪.১৭ সংলাপের আগে দলগুলোর কাছে কাছে চিঠি দেয়া :

সংলাপে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কারা অংশ নেবেন তাদের ১০ জন করে প্রতিনিধির তালিকা চায় নির্বাচন কমিশন। দলগুলোর দেয়া তালিকার ভিত্তিতে ১৫টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির সঙ্গে নির্বাচনী বিভিন্ন আইন, রোডম্যাপ, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও দলের নিবন্ধন বাতিল, দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, নিয়মিত কাউন্সিল হওয়া, বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব জমা দেয়ার বিধান, দলের প্রতিটি পর্যায়ে গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিধানসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে তাদের মতামত নেয় নির্বাচন কমিশন। সংলাপে নির্বাচন কমিশন নিজেদের কোন মতামত না দিয়ে শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের মতামত মনোযোগ সহকারে শোনে এবং সে মোতাবেক পরবর্তীতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, আরপিও সংশোধন করে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের সময় প্রায় অধিকাংশ দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কেন্দ্রীয় নেতারা অংশ নেন। শুধু আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া নির্বাচন কমিশনের সংলাপে অংশ নেয়নি। তবে, সংলাপে অংশ নিতে নির্বাচন কমিশনকে থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সাধারণ সম্পাদক বরাবর চিঠি দেয়া হয়েছিলো। প্রথম দফা সংলাপে নির্বাচন কমিশন ১২ সেপ্টেম্বর ইসলামী ঐক্যজোটের সঙ্গে সংলাপ প্রথম শুরু করে। আর ২০০৭ সালের ২ ডিসেম্বর সংলাপ শেষ হয় বিকল্পধারার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। যদিও প্রথম দফায় বিএনপি'র সঙ্গে ইসির সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় নাই। পরে দ্বিতীয় দফা সংলাপ শুরু হয় ২০০৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি, যেটি শেষ ২৮ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় দফায়ও ২০০৮ সালের ২৭ এপ্রিলে বিএনপি'র সংস্কারপন্থী অংশের সঙ্গে (সাইফুর রহমান-মেজর হাফিজ গ্রুপ) সংলাপ করে নির্বাচন কমিশন। পরে দুর্নীতির অভিযোগে আটক বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদের পাশে স্থাপিত বিশেষ কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর ২০০৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি দলটির সঙ্গে সংলাপ করতে সমর্থ হয় নির্বাচন কমিশন। সংলাপে ১১ সদস্যবিশিষ্ট দলটির নেতৃত্ব দেন খালেদা জিয়া মনোনিতো বিএনপি'র মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন।

৪.১৮ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ :

নির্বাচন কমিশন ১৫টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তিনদফা সংলাপ করে নির্বাচনী আইনের বিভিন্ন সংস্কার বিষয়ে দলগুলোর মতামত জানতে চায়। শুধু তাই নয়, চূড়ান্তপর্যায়ে কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোকে জানায় যে, তারা নির্বাচনী আইনের বিভিন্ন সংস্কার বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি আর সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে সংলাপে পাওয়া নির্বাচনী আইনের প্রস্তাবের কোন কোন বিষয়গুলো সন্নিবেশ করা হবে আর কোনগুলো হবেনা। যদিও ১৪টি দলের নির্দিষ্ট তালিকার বাইরে কমিশন বিকল্পধারা বাংলাদেশ ও এলডিপি'র সঙ্গে সংলাপ করে।

৪.১৯ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের প্রথমদফা সংলাপ : অনেক আলোচনা-সমালোচনার পর অবশেষে ২০০৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বরে ইসলামি ঐক্যজোটের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সংলাপের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচনী আইন ও অন্যান্য বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সংলাপ শুরু করে। সংলাপ শেষ হয় ২ ডিসেম্বর বিকল্পধারার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। প্রথম পর্যায়ে দেশের ১৫টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করলেও বিএনপির সঙ্গে সংলাপ করতে ব্যর্থ হয় ড. শামসুল হুদা নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন।

সারণি : ২৭

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের প্রথমদফা সংলাপ :

রাজনৈতিক দল	তারিখ
১. ইসলামী ঐক্যজোট	১২ সেপ্টেম্বর ২০০৭
২. কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭
৩. গণতন্ত্রী পার্টি	২০ সেপ্টেম্বর ২০০৭
৪. জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	১ নভেম্বর ২০০৭
৫. জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	৪ অক্টোবর ২০০৭
৬. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ (ইনু)	৩০ অক্টোবর ২০০৭
৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ (রব)	২২ অক্টোবর ২০০৭
৮. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৫ অক্টোবর ২০০৭
৯. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর)	২৮ অক্টোবর ২০০৭
১০. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪ নভেম্বর ২০০৭
১১. বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন)	২৭ নভেম্বর ২০০৭
১২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, সিপিবি	২৫ নভেম্বর ২০০৭
১৩. বাংলাদেশের সাম্যবাদি দল (এমএল)	২৯ নভেম্বর ২০০৭
১৪. বিকল্পধারা বাংলাদেশ	২ ডিসেম্বর ২০০৭
১৫. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, এলডিপি	৩৩ ডিসেম্বর ২০০৭

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

৪.২০ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের দ্বিতীয়দফা সংলাপ:

দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচন কমিশন দেশের ১৫টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করে। সংলাপ শুরু হয় ২০০৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারিতে আর শেষ হয় ২৮ ফেব্রুয়ারিতে।

সারণি : ২৮

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের দ্বিতীয়দফা সংলাপঃ

রাজনৈতিক দল	তারিখ
১. ইসলামী ঐক্যজোট	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
২. কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
৩. গণতন্ত্রী পার্টি	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
৪. জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
৫. জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
৬. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ (ইনু)	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ (রব)	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
৮. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
৯. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর)	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
১০. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
১১. বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন)	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
১২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, সিপিবি	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
১৩. বাংলাদেশের সাম্যবাদি দল (এমএল)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
১৪. বিকল্পধারা বাংলাদেশ	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
১৫. এলডিপি	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

৪.২১ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের তৃতীয় দফা সংলাপ : তৃতীয় দফায় ১৫টি দলের সঙ্গে সংলাপ করে নির্বাচন কমিশন। ২০০৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বরে সংলাপ শুরু হয় আর শেষ হয় ২০ সেপ্টেম্বরে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ২৯

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের তৃতীয়দফা সংলাপ :

দল	তারিখ
১. ইসলামী ঐক্যজোট	২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮
২. কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮
৩. গণতন্ত্রী পার্টি	৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮
৪. জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮
৫. জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮
৬. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ (ইনু)	৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮
৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ (রব)	৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮
৮. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮
৯. ন্যাপ (মোজাফফর)	৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮
১০.বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮
১১. বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন)	৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮
১২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, সিপিবি	৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮
১৩. বাংলাদেশের সাম্যবাদি দল (এমএল)	৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮
১৪. বিকল্পধারা বাংলাদেশ	৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮
১৫. এলডিপি	৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

৪.২২ বিএনপিকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা :

নির্বাচন কমিশন ২০০৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ২০০৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৫টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মোট তিনদফা সংলাপ করে। আর বিএনপির দুই গ্রুপের সঙ্গে একবার করে সংলাপে বসে নির্বাচন কমিশন। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিএনপিতে ভাঙ্গন, বহিস্কার ও পাল্টাপাল্টি কমিটি গঠন এবং সংলাপের জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে চিঠি দেয়াকে কেন্দ্র করে আদালত পর্যন্ত গড়ালে নির্বাচন কমিশন সংলাপের সিডিউল সময়ের মধ্যে বিএনপির সঙ্গে সংলাপ করতে ব্যর্থ হয়। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে দুর্নীতির অভিযোগে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আটকের আগে দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে বিএনপি'র মহাসচিব মান্নান ভূইয়া ও যুগ্ম মহাসচিব আশরাফ হোসেনকে থেকে বহিস্কার করেন এবং খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে মহাসচিবের দায়িত্ব দেন। ২০০৭ সালের ৪ নভেম্বর বিএনপি নেতা হান্নান শাহের নেতৃত্বে ১ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনে গিয়ে সিইসি ড. শামসুল হুদার সঙ্গে দেখা করে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে দলের মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে সংলাপের জন্য চিঠি দিতে অনুরোধ জানান। চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে, দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি'র গঠনতন্ত্রের ৫(গ) ও ৮(খ)২ ধারা অনুযায়ী মান্নান ভূইয়াকে বহিস্কার করেছেন। যেটি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী করা হয়েছে। আর অন্যদিকে, ২৯ অক্টোবর সাবেক অর্থমন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এম সাইফুর রহমানের গুলশানের জালালাবাদ বাসভবনে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে সাইফুর রহমান ও মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব করা হয়। আর এতেই শুরু হয় কোন্দল ও বিতর্ক; এই বিতর্কের মধ্যেই সংলাপের জন্য নির্বাচন কমিশন বিএনপির সংস্কারপন্থী অংশের মহাসচিব মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে চিঠি দেয়। এর তীব্র প্রতিবাদ করে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপির মূল অংশটি। বিষয়টি নিয়ে সারাদেশে তুমুল আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় বয়ে গেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা বিএনপির গঠনতন্ত্র দেখে সিদ্ধান্তের কথা জানানোর কথা বলেন। পরবর্তীতে মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে চিঠি দেয়া সময়ের প্রয়োজনে অর্থাৎ 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি' বলে মন্তব্য করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। যদিও পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা বিএনপি'র সংস্কারপন্থী গ্রুপকে সংলাপের জন্য চিঠি দেয়ায় কমিশনের পক্ষ থেকে দু:খ প্রকাশ করেন। বিএনপি'র খালেদা জিয়াপন্থী অংশের মহাসচিব ছিলেন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ ও বিএনপিদলীয় সাবেক হুইপ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) হাফিজকে সংলাপের জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে চিঠি দেয়ার প্রতিবাদে কারাবন্দি থাকা অবস্থায় আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে ১৩ নভেম্বর উচ্চ আদালতে রিট করেন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া। বেগম জিয়া তার আইনজীবীর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠায়। লিগ্যাল

নোটিশে বলা হয় যে, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মেজর হাফিজকে দেয়া চিঠি প্রত্যাহার করা না হলে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে । রিটের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ২০০৭ সালের ১৮ নভেম্বর মেজর হাফিজকে দেয়া ইসির চিঠির কার্যকারিতা স্থগিত করলে সংস্কারবাদি ঐ অংশের সঙ্গে সংলাপ ভেস্তে যায়। পরে ১০ এপ্রিল রিট আবেদন খারিজ হয়ে গেলে নির্বাচন কমিশন বিএনপির দুই পক্ষকে এক হতে ৩ দিন সময় বেধে দেয়। ঐ সময়ের মধ্যে বিএনপি দুই পক্ষ এক না হওয়ায় কমিশন আবারো সংলাপের জন্য বিএনপির সংস্কারপন্থী (সাইফুর-মেজর হাফিজ) গ্রুপকে আহবান জানায়। পরে ২০০৮ সালের ২৭ এপ্রিল বিএনপি'র সংস্কারপন্থী গ্রুপের সঙ্গে সংলাপ করে নির্বাচন কমিশন। সংলাপে ১৫ সদস্যের প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন আহমেদ। প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন : লে. জেনারেল (অব.) জেড এ খান, লে. জেনারেল (অব.) মাহাবুবুর রহমান, চৌধুরী কামাল ইবনে ইফসুফ, ফজলুল আজিম, ড. ওসমান ফারুক, মোফাজ্জল করিম। বিএনপির এই অংশের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ নিয়ে দেশব্যাপী ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক চলতে থাকে। বিএনপি'র ১৩৬ জন সাবেক সংসদ সদস্য, ৮০-এর দশকের ছাত্রনেতা খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপির মূল অংশকে সংলাপের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহবান জানায়। বিএনপি'র (খালেদা) পক্ষ থেকে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে সংলাপের জন্য চিঠি দিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে ৩ বার চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানায়। অবশেষে নির্বাচন কমিশন খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন বরাবর এক চিঠির মাধ্যমে সংলাপের জন্য আহবান জানায়। যদিও এই চিঠিতে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে মহাসচিব হিসেবে উল্লেখ না করে বিএনপি নেতা হিসেবে সম্বোধন করা হয়। অবশেষে ২০ সেপ্টেম্বর বিএনপি'র (খালেদা জিয়া গ্রুপের) সঙ্গে সংলাপ করে ড. শামসুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন। দলের মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের প্রতিনিধিদল বহুল আলোচিতো ঐ সংলাপে অংশ নেন। সংলাপে বিএনপি নেতারা নির্বাচনী আইন, আচরণবিধি, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিধিমালাসহ নির্বাচনকেন্দ্রীক বিভিন্ন বিষয়ে বিএনপি'র মতামত ও অবস্থান তুলে ধরেন।

সারণি : ৩০

বিএনপি'র সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ :

রাজনৈতিক দল	সংলাপের তারিখ
বিএনপি (সংস্কারপন্থী সাইফুর-হাফিজ গ্রুপ)	২৭ এপ্রিল ২০০৮
বিএনপি (খালেদাপন্থী খোন্দকার দেলোয়ার গ্রুপ)	২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

৪.২৩ মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা ও দলের নিবন্ধন বাতিলের দাবি :

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২০০৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সঙ্গে আলোচনায় বসে নির্বাচন কমিশন। দলটির নেতৃত্ব দেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তৃতীয় তলায় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সংলাপে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তরা নির্বাচনে যাতে অংশ নিতে না পারেন এবং যুদ্ধাপরাধী দল জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, এনডিপিসহ ১৯৭১ সালে যে সব রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করে পাক বাহিনীকে গণহত্যায় সহযোগিতা করেছে সেই সব দলকে নিবন্ধন না দিতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি প্রথম আহবান জানান কাদের সিদ্দিকী ও তার দল কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ। পরে সংলাপ শেষে সাংবাদিকদের কাছেও একই বক্তব্য তুলে ধরেন কাদের সিদ্দিকী। তিনি বলেন–

''জামায়াত স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে পক্ষ অবলম্বন করেছিলো, এ দেশের মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছিলো, মা বোনদের ধর্ষন করেছিলো। তাদের সাধারণ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিলো-এ যুক্তিতে জামায়াতের কেউ পার পাবেনা। রাজাকারকে ক্ষমা করা আর জামায়াতকে ক্ষমা করা এক কথা নয়। এ দলটি পাকিস্তান আমলে ব্রিটিশদের গোলামি করেছিলো, আর বাংলাদেশ আমলে পাকিস্তানে গোলামি করেছে। তারা এখনো তাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। তারা যদি নতুন দল করে তবে আমাদের আপত্তি নেই।"

সূত্র : প্রথম আলো; ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর সেই দাবি ঐদিন ও পরের দিন বিভিন্ন রেডিও, টেলিভিশন, অন–লাইন পত্রিকায় ফলাও করে প্রচারিত হয়। সেই শুরু, এর পর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি সংলাপে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা ও যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন না দিতে দেশের প্রায় অধিকাংশ দলই আহবান জানায়। তবে সংলাপের এক পর্যায়ে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে সংলাপে বসে নির্বাচন কমিশন। সংলাপ শেষে নির্বাচন কমিশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নবানে জর্জরিত হয় জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। এক প্রশ্নের জবাবে দলটির সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ দম্ভোক্তির সঙ্গে দাবি করে বলেন,

''বাংলাদেশে স্বাধীনতাবিরোধী কোন শক্তি নাই, আগেও ছিলোনা, যুদ্ধাপরাধীও নেই। যুদ্ধাপরাধী ছিলো ১৯৫ জন। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত সরকার ১৯৫ জনকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলো। তারা সবাই পাকিস্তান আর্মিও সদস্য। ঐ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে সিমলা চুক্তির সময় জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে মাফ করে দেয়া হয়েছে। তখন থেকে বাংলাদেশে আর কোন যুদ্ধাপরাধী নেই।"

সূত্র : প্রথম আলো; ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭।

ঐদিন ও পরের দিন বাংলাদেশের রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম ফলাও করে মুজাহিদের ঐ বক্তব্য প্রচার করে।

৪.২৪ নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা :

ড. এ টি এম শামসুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন অবাধ, শান্তিপূর্ণও সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন একটি রোডম্যাপ তৈরী করে। রোডম্যাপ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সংলাপের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর আমন্ত্রণ জানায় এবং কোন সময়ে তারা কি কি কাজ হাতে নেবে এবং শেষ করবে সে পরিকল্পনাও তৈরী করে।

৪.২৫ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের ব্যবহার :

রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে একটি অবাধ, স্বচ্ছ ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স অর্থাৎ ট্রান্সপারেন্ট ব্যালট বক্স ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। এ কাজে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় কানাডিয়ান উন্নয়ন সংস্থা সিডা। এটি বাস্তবায়ন করে জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থা-ইউএনডিপি ও বাংলাদেশ সরকার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের নমুনাও সংগ্রহ করে নির্বাচন কমিশন। আর রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে নির্বাচনী আইনের সংস্কার বিষয়ে সংলাপের সময় স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের নমুনা দেখানো হয়। পরে সব কিছু বিবেচনা করে কানাডার দেয়া স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স দশম সংসদ নির্বাচনে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রজেক্টের মেয়াদ ছিলো ১ জুলাই ২০০৮ থেকে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত । ইউরোপিয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, কোরিয়া এবং ইউএনডিপি মিলে এই প্রজেক্টের ৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে ৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দেয়। বাকি ২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেয় বাংলাদেশ সরকার। **(Eicher et al, 2010)**

নবম সংসদ নির্বাচনের আগে এটি পরীক্ষামূলকভাবে এফবিসিসিআই ও ঢাকা অফিসার্স ক্লাবের নির্বাচনে ব্যবহার করা হয়। অবশেষে, ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম সংসদ নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার হয়। ৪৫ লিটার ধারণ ক্ষমতার স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতিটি কক্ষে ব্যবহার করা হয়। আর প্রতিটি কেন্দ্রে একটি অতিরিক্ত ব্যালট বাক্স সরবরাহ হয় সমস্যা মোকাবেলায়।

৪.২৬ রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ ভাগ নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত করার বিধান :

নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের সংস্কার প্রস্তাবে বিধান রাখে যে, ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কমিটিকে কমপক্ষে ৩৩ ভাগ মহিলা সদস্য রাখতে হবে। ইসি দলগুলোর সঙ্গে যখন সংলাপ করে তখন তারা কমিশনের প্রস্তাব মেনে নেয় এবং পরে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে দলের কমিটিতে ৩৩ ভাগ নারী সদস্য রাখার বিধান করা হয়; যা দেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

৪.২৭ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচনী আইন :

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনী আইন পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে। ড. শামসুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন সত্যিকার অর্থে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনী আইনের সংস্কার করে। আর রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন এবং বিশেষ করে এদেশের আপামর জনগণ নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন সংস্কারমূলক আইন ও বিধিবিধান মেনে নেয়। ঐ সময়ে দেশে অগণতান্ত্রিক অর্থাৎ অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থাকায় অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রনয়ণ করে।

৪.২৮ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত :

রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা এবং নিবন্ধিত হতে অবশ্য পালনীয় ১০টি শর্ত উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজনৈতিক দলের সংস্কার প্রস্তাবে বলা হয় ২০০৮ সালের ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য নবম সংসদ নির্বাচনের আগে দলগুলোকে অবশ্যই নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হতে হবে। এরই আলোকে ২০০৮ সালের জুন মাসের মধ্যে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিষয়ে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে আইনটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের খসড়ায় অন্তর্ভূক্ত করে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের এই শর্তগুলো হলো :

১. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দল পরিচালিত হবে এই মর্মে দলীয় গঠনতন্ত্রে বিধান থাকা।
২. দলের সকল পর্যায়ের কমিটির সদস্যদের অনধিক ৩ বছর অন্তর প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবার বিধান থাকা।
৩. দলের সকল পর্যায়ের সব কমিটিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ ভাগ সদস্যপদ সংরক্ষণ ও ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করার বিধান রাখা।
৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রদের সমন্বয়ে অঙ্গ অথবা সহযোগি সংগঠন তৈরী করা নিষিদ্ধ করা।

Dhaka University Institutional Repository

৫. সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সমন্বয়ে অঙ্গ সংগঠন তৈরী নিষিদ্ধ।

৬. সরকারি কিংবা বেসরকারি আর্থিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারিদের সমন্বয়ে অঙ্গসংগঠন তৈরী নিষিদ্ধ।

৭. দলের সদস্যদের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সুস্পষ্ট বিধান থাকা।

৮. স্বাধীনতার পর কোন একটি নির্বাচনে কমপক্ষে একটি আসন প্রাপ্তি অথবা কমপক্ষে অন্তত একটি সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২ ভাগ প্রাপ্তি অথবা দেশের কমপক্ষে অর্ধেক জেলায় কার্যকর জেলা ও উপজেলা কমিটি, দলের কার্যালয় থাকা; প্রত্যেক জেলায় কমপক্ষে এক হাজার ভোটার ও উপজেলায় কমপক্ষে ২০০ ভোটারকে দলের সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্তি করা এবং কার্যকর কেন্দ্রীয় কমিটি ও কার্যালয় থাকা।

৯. কোন রাজনৈতিক দলের বিদেশে শাখা থাকতে পারবেনা।

১০. কোন দল থেকে মনোনয়ন পেতে হলে কমপক্ষে ছয়মাস আগে প্রার্থীকে ঐ আসনের নেতা-কর্মীদের ভোটে জয়লাভ করতে হবে।

৪.২৯ গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮ :

নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচনী আইনের সংস্কার বিষয়ে দু'দফা সংলাপের পর নির্বাচনী আইনের খসড়া তৈরী করে, যার নাম দেয়া হয় গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮। ২০০৮ সালের ১৩ জুলাই ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অধ্যাদেশটি নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়। তবে অধ্যাদেশটি অনুমোদনের পর অনেক রাজনৈতিক দলের নেতারা সমালোচনা করে বলেন, সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধু দৈনন্দিন রুটিন কাজ করবে অন্য কিছু নয়। আইন প্রনয়ণ ও সংশোধনের এখতিয়ার একমাত্র নির্বাচিত সরকারের। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচিত নয় বিধায় তারা এই আইন করতে পারেনা। অনেক রাজনৈতিক দল অবশ্য দাবি করে বলে তাদের পক্ষে গণপ্রতিনিধিত্ব ২০০৮-এর শর্তগু পূরণ করা অসম্ভব। অবশেষে, গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

৪.৩০ সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮ :

২০০৮ সালের ৬ অগাস্ট উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ-২০০৮ পাশ হয়। সংশোধিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন যে সব আইন চূড়ান্তকরে সেগুলো হলো :

- দুর্নীতিতে দোষি সাব্যস্ত ও ফৌজদারি মামলায় সর্বনিম্ন ২ বছর কারাদণ্ড হলে সাজা ভোগের ৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে কোন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।
- সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেয়ার ৩ বছরের মধ্যে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া যাবেনা। নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর মনোনয়নপত্রের ফর্মে ৮টি তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক।
- রাজনৈতিক দলের কমপক্ষে ১০টি প্রশাসনিক জেলায় জেলা কমিটি ও ৫০টি উপজেলায় উপজেলা কমিটি থাকতে হবে অথবা দলের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ ভাগ মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ২০২০ সাল নাগাদ এ লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন থাকতে পারবেনা।
- ছাত্র, শিক্ষক, বিভিন্ন পেশার বা শ্রমিকদের নিয়ে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন থাকতে পারবেনা।
- নির্বাচনে ৩টি আসনের বেশি আসনে কোন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেনা।
- ভোটের সময় ব্যালটে 'না' ভোটের বিধান থাকবে। কোন প্রার্থীকে ভোট দেয়ার সময় পছন্দ না হলে উপরের কাউকে না এর মাধ্যমে 'না' ভোট দেয়া যাবে।
- কোন প্রার্থী স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত হয়ে কোন অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে ঐ নিবন্ধিত দলটি নিবন্ধনের যোগ্য হিসেবে বিবেচিতো হবেনা। কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী সংখ্যা ২০০ বা বেশি হলে ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা, ১০০ আসনের বেশি কিন্তু ২০০ আসনের কম হলে ৩ কোটি টাকা, ৫০ এর বেশি আসন কিন্তু ১০০ থেকে কম হলে ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা এবং ৫০ এর নিচে আসন হলে ৭৫ লাখ টাকা ব্যয় করতে পারবে।
- কারো কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা বা তার চেয়ে বেশি টাকা অনুদান নিতে হলে তা অবশ্যই চেকের মাধ্যমে নিতে হবে।
- কোন রাজনৈতিক দল অন্য কোন দেশি-বিদেশি এনজিও, বিদেশি নাগরিক বা বিদেশি নাগরিক দ্বারা পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে উপহার, অনুদান, গ্র্যান্ট বা কোন অর্থ নিতে পারবেনা।
- কোন ঋণখেলাপি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেনা; তবে এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কৃষি ঋণকে বিবেচনা করা হবেনা।
- দেশের ভেতরে বা আন্তর্জাতিক আদালতে দণ্ডিত কোন ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেনা।

৪.৩১ নবম সংসদ নির্বাচনের আগে ইসি'র সঙ্গে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ : দেশের অসংখ্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ৩৯টি দল নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন শর্ত পূরণ করায় ঐসব দলগুলোকে নিবন্ধন দেয় নির্বাচন কমিশন। নিবন্ধনের আগে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দলগুলোর সম্পর্কে খোঁজ-খবর ও যাচাই-বাছাই করা হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি(এরশাদ)সহ অধিকাংশ বড় দলগুলো নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন শর্ত মানায় সহজেই নিবন্ধন পেয়ে যায়। তবে জামায়াতে ইসলামীকে বেশ কিছু শর্ত পূরণে চিঠি দেয়া হয়। যেমন : নিবন্ধনের আগে দলটির নাম ছিলো জামায়াতে ইসলাম বাংলাদেশ। পরে জামায়াত ইসির দেয়া শর্ত পূরণ করে দলটির নাম কিছুটা পরিবর্তন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে সময় চায় এবং শর্ত পূরণ করে। নাম কিছুটা পরিবর্তন করে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারি রাজনৈতিক দলটি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নাম ধারণ করায় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হয় দলটি। মোট ৩৯টি রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন দিলেও নবম সংসদ নির্বাচনের পর ফ্রিডম পার্টির নিবন্ধন বাতিল করে নির্বাচন কমিশন।

সারণী ৩১ :

নবম সংসদ নির্বাচনের আগে ইসি'র সঙ্গে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ :

দল	প্রতীক
১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা
২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল-বিএনপি	ধানের শীষ
৩. জাতীয় পার্টি	লাঙ্গল
৪. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	দাঁড়িপাল্লা
৫. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ (ইনু)	মশাল
৬. বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন)	হাতুড়ি
৭. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	ছাতা
৮. বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, বিজেপি	গরুর গাড়ি
৯. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	হাতপাখা
১০. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	খেজুর গাছ
১১. বিকল্পধারা বাংলাদেশ	কুলা
১২. জাকের পার্টি	গোলাপ ফুল
১৩. ইসলামী ঐক্যজোট (মুফতি আমিনী)	মিনার
১৪. জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি, জাগপা	হুক্কা
১৫. কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা
১৬. গণফোরাম	উদীয়মান সূর্য
১৭. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, সিপিবি	কাস্তে
১৮.বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান)	মই
১৯. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জেএসডি (রব)	তারা
২০. বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্ট্র	মোমবাতি
২১. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ	রিক্সা
২২.বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর)	কুঁড়েঘর

২৩. বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	হাতঘড়ি
২৪. বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	ফুলের মালা
২৫. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	বটগাছ
২৬. প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল, পিডিপি	বাঘ
২৭. ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	আম
২৮. জাতীয় পর্টি, জেপি (মঞ্জু)	বাইসাইকেল
২৯. বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পাটি, বাংলাদেশ ন্যাপ	গাভী
৩০. গণফ্রন্ট	মাছ
৩১. ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন	চাবি
৩২. গণতন্ত্রী পার্টি	কবুতর
৩৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	কোদাল
৩৪. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	হারিকেন
৩৫. ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	চেয়ার
৩৬. খেলাফত মজলিস (মাওলানা ইসহাক)	দেয়াল ঘড়ি
৩৭. বাংলাদেশের সাম্যবাদি দল (এম.এল)	চাকা
৩৮. বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (ডা. মতিন)	কাঠাল
৩৯. ফ্রিডম পার্টি	কুড়াল

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

৪.৩২ জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ :

নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে ১৫১টি প্রতীক বরাদ্দ দেয় যাতে করে নির্বাচনে প্রার্থীরা ঐ নির্ধারিত প্রতীকে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৩২

জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ :

আনারস	ছাতা	বালতি
আপেল	ঝুমঝুমি	বাঁশি
আম	টাইপ রাইটার	বাঁশের ঝুঁড়ি
আংটি	টিফিন ক্যারিয়ার	ব্যাটারি
ইট	টিয়া পাখি	ব্যাডমিন্টন (র‌্যাকেট)
উদিয়মান সূর্য	টেবিল	বেঞ্চ
উড়োজাহাজ	টেবিল ঘড়ি	বেলুন
একতারা	ট্রাক্টর	বৈদ্যুতিক পাখা
কবুতর	ট্রাক	বৈদ্যুতিক বাল্ব
কমলালেবু	টেলিফোন	বৈয়ম
করাত	টেলিভিশন	মই
কলসি	ঠেলাগাড়ি	মগ
কলার ছড়ি	ডাব	মটর গাড়ি
কাঠাল	ডালিম	মটর সাইকেল
কাপ-পিরিচ	ঢেঁকি	মশাল
কামরাঙ্গা	তবলা	ময়ুর
কাস্তে	তারা	মাইক
ক্যারাম বোর্ড	তালা	মাছ
ক্যামেরা	থালা	মাথাল
ক্রিকেট ব্যাট	দাঁড়ি পাল্লা	মিনার
কেটলি	দাবা বোর্ড	মুলা
কুমির	দালান	মোরগ
কুলা	দেয়াশলাই	মোমবাতি
কুড়াল	দেয়ালঘড়ি	মোড়া
কুঁড়েঘর	দোয়াত-কলম	রকেট

কোদাল	ধানের শীষ	রিক্সা
খরগোশ	নলকুপ	রেডিও
খাট	নোঙ্গর	রেল ইঞ্জিন
খেঁজুর গাছ	নৌকা	লাঙ্গল
গরুর গাড়ি	পান পাতা	লাটিম
গাভি	পালকি	শীল পাটা
গামছা	পিঞ্জর	শাখা
গিটার	পিঁড়ি	স্টিল আলমারি
গ্লাস	পেঁপে	সিংহ
গোলাপ ফুল	প্রজাপতি	স্যুটকেস
ঘন্টা	ফুটবল	সেলাই মেশিন
ঘুড়ি	ফ্লাস্ক	হরিণ
ঘোড়া	ফুলকপি	হাত (পাঞ্জা)
চরকা	ফুলের টব	হাত ঘড়ি
চাকা	ফুলের মালা	হাত পাখা
চাবি	বক	হাঁস
চশমা	বাঘ	হাতি
চাঁদ	বাস	হাতুড়ি
চামচ	বই	হারিকেন
চিংড়ি	বটগাছ	হুক্কা
চেয়ার	বড়ঁশি	হেলিকপ্টার
ছড়ি	বাই সাইকেল	ক্রস চিহ্ন

সূত্র : পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

অধ্যায় : পাঁচ

৫.১ ভূমিকা :

নবম জাতীয় সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচনী আইন মাঠ পর্যায়ে কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে সে বিষয়ে দু'টি কেস স্টাডির মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য পাওয়া গেছে। আলোচ্য তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এখানে।

৫.২ গবেষণা ফলাফল :

নির্বাচনী আইন ও মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে কিভাবে হয়েছে সে ব্যাপারে যথেষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে। তবে কেস স্টাডির পর এই সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া গেছে যে, নির্বাচনী আইন থাকলেও বেশিরভাগ সময় এর সঠিক প্রয়োগ হয় না। ২০০৬ সালে রাজনৈতিক গোলোযোগের পর দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্গঠিত হয়। সেই সরকারকে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে অভিহিত করা হয়। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করার পেছনে সেনাবাহিনীর সক্রিয় ভূমিকা ছিলো। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় নির্বাচনও শান্তিপূর্ণসম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে, নবম সংসদ নির্বাচনের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি দেশে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন। ঐ নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় ছিলো। কিন্তু বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ তৃতীয় উপজেলা নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের অনুকূলে আনতে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছে। নির্বাচনে সরকার সমর্থক প্রার্থী ও সমর্থকরা প্রভাব বিস্তার করেছে, আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে, ব্যালট বাক্স ছিনতাই করেছে, প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়েছে, সহিংসতা সৃষ্টি করেছে। এক কথায়, রাজনৈতিক সরকারের অধীনে ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ায় নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়েছে; ভোটের আগে ও পরে সহিংসতা হয়েছে। অর্থাৎ তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়নি।

৫.৩ তথ্য বিশ্লেষণ :

গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, গবেষণাপূর্ব অনুসিদ্ধান্ত আংশিক সত্য হয়েছে। যেহেতু নবম জাতীয় সংসদে ঢাকা-৬ আসনের নির্বাচন শান্তিপূর্ণঅনুষ্ঠিত হয়েছে সেহেতু অনুসিদ্ধান্ত কিছুটা সত্য হয়েছে। অন্যদিকে, গবেষণায় দেখা গেছে, তৃতীয় উপজেলা পরিষদে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে সহিংসতা ও

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক প্রভাব থাকায় ঐ নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বলে গবেষণার অনুসিদ্ধান্ত সত্য প্রমাণ হয়নি, আংশিক প্রমাণ হয়েছে।

৫.৪ নির্বাচনী আইন মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে বাধাসমূহ :

গবেষণালব্ধ প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় বাংলাদেশে নির্বাচনী আইন বাস্তবায়নে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে; সেগুলো হলো :

- প্রশাসনিক ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে নির্বাচনের সময় রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলে তারা নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা, কর্মচারিদের ওপর খবরদারি করেন। ফলে নির্বাচনে এর প্রভাব পড়ে।
- রাজনৈতিক দলগুলো অযথা হস্তক্ষেপ করে নির্বাচনী ফলাফল নিজেদের দল ও সমর্থিত প্রার্থীর অনুকূলে নেয়ার চেষ্টা করে।
- আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বিদ্যমান থাকে।
- নির্বাচনের সময় অনেক ক্ষেত্রে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত লোকবলের অভাব দেখা যায়।
- আইনী জটিলতা থাকায় সাধারণ মানুষ ভুক্তভোগী হয়।
- সাধারণ মানুষের নির্বাচনী আইন-কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকে।
- প্রার্থীরা নির্বাচনের সময় ফলাফল নিজের পক্ষে নিতে রাতের আঁধারে কালো টাকা ছড়ায়।
- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিরুদ্ধে পেশি শক্তি খাটিয়ে ফলাফল নিজের পক্ষে আনতে চেষ্টা করে প্রভাবশালীরা।
- নির্বাচন সুষ্ঠু ও সবার জন্য গ্রহণযোগ্য করতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল অসহযোগিতা করে।
- আইন না মানার দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে বিরাজমান থাকে বলে নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়।
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কম থাকায় সঠিক সময়ে দ্রুততার সঙ্গে আইনের প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।
- নির্বাচনী কর্মকর্তাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা না থাকায় অনেক সময়ে দ্রুততার সঙ্গে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয়।
- কলোনিয়াল মানসিকতা বিরাজ করে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাঝে।
- তথ্য প্রযুক্তির অভাব দেখা যায় নির্বাচনের সময়।

- নির্বাচনী কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট তা অনেক সময় থাকে বলে নির্বাচনে এর প্রভাব পড়ে।
- ভোট দিতে কেন্দ্রে আসার সময় ও ভোট দিয়ে যাওয়ার সময় ভোটাররা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে; বিশেষ করে সংখ্যালঘু ও নারী ভোটাররা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।
- নির্বাচনের সময় নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা যাতায়াত ব্যবস্থার সময় যানবাহনের সংকট থাকে।
- নির্বাচনের সময় লজিস্টিক অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির অভাব থাকে।
- প্রশাসনিক ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নির্বাচনী কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়, যেটা নির্বাচনের কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- রাজনৈতিক সরকারের আমলে নির্বাচন হলে ঐ দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা হয় ফলে নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধার সম্মুখিন হতে হয়।

৫.৫ নির্বাচনী আইন বাস্তবায়নে সুপারিশসমূহ :

গবেষণাটি করতে গিয়ে নির্বাচনী আইনের বাস্তবায়নে অসংখ্য সুপারিশ পাওয়া গেছে। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো :

- নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করতে হবে যাতে করে মানুষ ভয়ে আচরণবিধি মেনে চলে।
- আচরণবিধি লঙ্ঘনকারিরা প্রভাবশালী হওয়ায় তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষী পাওয়া যায়না। অনেক সময় ভিকটিম ব্যক্তি পুলিশী হয়রানি, মামলার হাজিরা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে মামলায় সাক্ষ্য দেয় না। তাই মামলা ও পরবর্তী হয়রানি মোকাবেলায় আইনকে আরো সহজ করতে হবে।
- মানুষ যেন স্বেচ্ছায় নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলে সে বিষয়ে তাদের আরো বেশি সচেতন করে তুলতে হবে।
- সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে পারলে নির্বাচনী আইন মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তারা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে।
- নির্বাচনের সময় পর্যাপ্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করতে হবে।
- নির্বাচনী আইন মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য কর্মঠ, চৌকষ ও সাহসী কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে।

- ভোটাররা যাতে নির্বাচনী আইন মেনে চলে সে জন্য পর্যাপ্ত সভা, সেমিনার ও অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নির্বাচনী আইন মানতে নির্বাচন কমিশনকে গণমাধ্যমে বেশি করে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে।
- বর্তমানে নির্বাচনী যে আইন আছে সেগুলোর বাস্তবায়ন মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে করতে হবে।
- সৎ, যোগ্য, মেধাবি ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে।
- রাজনীতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনীতিবিদদের আচরণে গুনগত পরিবর্তন আনতে হবে।
- রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা আনতে ব্যাপকভাবে সংস্কার আনতে হবে।
- প্রভাবশালীদের মনোনয়ন দেয়া বন্ধে তাদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার সংস্কৃতি পরিহার করতে হবে।
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী, প্রশাসন আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্বাচনের সময় নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।
- জনগণের কাছে আস্থা বাড়াতে নির্বাচন কমিশনে যোগ্য, মেধাবি, সৎ ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে হবে।
- জেলা প্রশাসকের পাশাপাশি রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিতে হবে।
- নির্বাচনে প্রার্থী, সমর্থক এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যাতে আচরণবিধি লঙ্ঘন করতে না পারে সে জন্য নির্বাচনী আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে।
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও নারী ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে সেজন্য পরিবেশ তৈরীর পাশাপাশি জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।
- সৎ, যোগ্য ও মেধাবি ব্যক্তিদের নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে হবে। তাহলে নির্বাচনে পেশি শক্তির প্রভাব ও কলো টাকার ব্যবহার অনেকাংশে কমতে পারে।
- নির্বাচনী আইন মানতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর পাশাপাশি জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।
- একটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।
- নির্বাচনকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে; এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে কঠোর হতে হবে।

- নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি মানতে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে নির্বাচন কমিশনকে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।
- নির্বাচন কমিশনকে সরকারের নিয়ন্ত্রমুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে।

৫.৬ উপসংহার :

গবেষণায় পাওয়া ফলাফলে দেখা গেছে–সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনী দায়িত্ব পালন করায় জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে নির্বাচনী আচরণবিধি মেনেছে। অর্থাৎ নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে শেষ হয়েছে। এই নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনেও অত্যন্ত শান্তিপূর্ণও গ্রহণযোগ্যভাবে ভোট হয়েছে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক সরকারের শাসনামলে দেশে তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সমর্থক প্রার্থী ও নেতা-কর্মীরা প্রভাব বিস্তার করে নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের অনুকূলে নেয়ার চেষ্টা করেছে। তাই নির্বাচন অনেকাংশেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। সিরাগঞ্জের বেলকুচি উপজেলায় দু'দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি প্রথম দফা নির্বাচনে সরকার সমর্থক প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, নানা অনিয়ম ও সহিংসতার কারণে ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়। পরে ৬ এপ্রিল পুন:নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী অত্যন্ত কঠোর হওয়ায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণশেষ হয়।

সংযুক্তি :

ব্রিটিশ আমলে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো :

ভারতীয়দের আদর্শ ও রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশের প্লাটফর্ম হিসেবে অসংখ্য রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। ঐ সব দলের অধীনে ভারতীয়রা তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও রাজনৈতিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ভারতের প্রথম ও প্রাচীন রাজনৈতিক দল ছিলো ভারতীয় কংগ্রেস; যারা হিন্দু জনগোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করেছে। পরে ভারতীয় মুসলমানরা তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশের স্বার্থে মুসলিম লীগ গঠন করেন।

সারণি : ৩৩

ব্রিটিশ আমলে সৃষ্টি ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো :

নম্বর	**রাজনৈতিক দল**	**প্রতিষ্ঠা সাল**
১	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	১৮৮৫
২	নিখিল ভারত মুসলিম লীগ	১৯০৬
৩	গদর পার্টি	১৯১৩
৪	নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা	১৯১৫
৫	সাউথ ইন্ডিয়ান পিপলস অ্যাসোসিয়েশন	১৯১৫
৬	ভারতের কমিউনিস্ট পাটি	১৯২০
৭	আকালী দল	১৯২০
৮	স্বরাজ পাটি	১৯২৩
৯	রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ	১৯২৫
১০	খুদাই খিদমতগার	১৯২৯
১১	খাকসার দল	১৯৩১
১২	কংগ্রেস স্যোসালিস্ট পাটি	১৯৩৫
১৩	কৃষক প্রজা পার্টি	১৯৩৬
১৪	ফরোয়ার্ড ব্লক	১৯৩৯
১৫	রেভেলিউশনারি সোস্যালিস্ট পাটি	১৯৪০
১৬	র‍্যাডিকেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	১৯৪০
১৭	জামায়াতে ইসলামী হিন্দ	১৯৪১

সূত্র : বাংলাদেশ নির্বাচন জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, জেলা উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০১২), এডভোকেট এবিএম রিয়াজুল কবীর কাওছার, বাংলাদেশ নির্বাচন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১২।

পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক দলগুলো :

পাকিস্তান আমলে অনেক রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। পাকিস্তানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐ রাজনৈতিক দলগুলো নিজ দলের মতাদর্শ নিজেদের মতো করে প্রকাশ ও প্রচার করে। এর মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, আতাউর রহমান ও অলি আহাদের নেতৃত্বে জাতীয় লীগ, খান সাইফুর রহমানের নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল অন্যতম। মুসলিম লীগ ভেঙ্গে অনেকগুলো ব্র্যাকেটবন্দি দলে পরিণত হয়। এছাড়া, মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পাটি (ন্যাপ), কমিউনিস্ট পার্টিসহ বেশ কিছু বাম রাজনৈতিক দলের জন্ম হয় পাকিস্তান আমলে।

সারণি : ৩৪

পাকিস্তান আমলে সৃষ্ট রাজনৈতিক দলগুলো :

নম্বর	**রাজনৈতিক দল**
১	পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
২	পাকিস্তান মুসলিম লীগ
৩	পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
৪	জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান
৫	নিজাম-ই-ইসলাম পার্টি
৬	গণতান্ত্রিক দল
৭	মুসলিম লীগ (জিন্নাহ)
৮	খেলাফতে রবক্ষানি পার্টি
৯	পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি
১০	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
১১	পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
১২	পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মতিন)
১৩	পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (দেবেশ)
১৪	পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি
১৫	কৃষক শ্রমিক পার্টি
১৬	শ্রমিক বাম সংঘ
১৭	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম
১৮	পূর্ব বাংলা বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি
১৯.	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল
২০	জাতীয় লীগ

সূত্র : বাংলাদেশ নির্বাচন জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, জেলা উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০১২), এডভোকেট এবিএম রিয়াজুল কবীর কাওছার, বাংলাদেশ নির্বাচন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১২।

এক নজরে বাংলাদেশের অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন :

সারণি : ৩৫

এক নজরে ১৯৭২ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত হয়ে যাওয়া সংসদ নির্বাচনগুলো :

নির্বাচনের তারিখ	ভোটকক্ষ	নির্বাচনী কর্মকর্তার সংখ্যা
প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ৭ মার্চ ১৯৭৩	১৫০৮৪	১৯২৪২৩
দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯	২১৯০৫	২২৩৩৫৫
তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ৭ মে ১৯৮৬	২৩২৭৯	২৯২৭২৭
চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ৩ মার্চ ১৯৮৮	সংখ্যা জানা যায়নি	২৮৩২৩৭
পঞ্চম সংসদ নির্বাচন, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১	২৪১৫৪	৩১৪৪৮০
ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬	২১১০৬	৩১৪৪৮০
সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১২ জুন ১৯৯৬	২৫৯৫৭	৩৭০২০৪
অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১ অক্টোবর ২০০১	২৯৯৭৮	৪৭৭৮৪২
নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯	৩৫২৬৩	৫৬৭১৯৬

সূত্র : জাতীয় সংসদ নির্বাচন হ্যান্ডবুক, আরএফইডি

প্রধান নির্বাচন কমিশনারদের সংখ্যা, মেয়াদ ও তালিকা :

সারণি : ৩৬

প্রধান নির্বাচন কমিশনারদের সংখ্যা, মেয়াদ ও তালিকা :

নং	**নাম**	**তারিখ**	**মেয়াদ**
১.	বিচারপতি মো. ইদ্রিস	০৭.০৭.১৯৭২ থেকে ০৭.০৭.১৯৭৭	৫ বছর
২.	বিচারপতি এ.কে.এম. নূরুল ইসলাম	০৮.০৭.১৯৭৭ থেকে ১৭.০২.১৯৮৫	৭ বছর ৭ দিন
৩.	বিচারপতি চৌধুরী এ.টি.এম. মাসউদ	১৭.০২.১৯৮৫ থেকে ১৭.০২.১৯৯০	৫ বছর
৪.	বিচারপতি সুলতান হোসেন খান	১৭.০২.১৯৯০ থেকে ২৪.১২.১৯৯০	১০ মাস ৭ দিন
৫.	বিচারপতি মো. আব্দুর রউফ	২৫.১২.১৯৯০ থেকে ১৮.০৪.১৯৯৫	৪ বছর ২৯ দিন
৬.	বিচারপতি এ.কে.এম. সাদেক	২৭.০৪.১৯৯৫ থেকে ০৬.০৪.১৯৯৬	১১ মাস ৯ দিন
৭.	বিচারপতি মোহাম্মদ আবু হেনা	০৯.০৪.১৯৯৬ থেকে ০৮.০৫.২০০০	৪ বছর ২৯ দিন
৮.	এম এ সাঈদ	২৩.০৫.২০০০ থেকে ২২.০৫.২০০৫	৫ বছর
৯.	বিচারপতি এম.এ. আজিজ	২৩.০৫.২০০৫ থেকে ২১.০১.২০০৭	১ বছর ৭ মাস ২৭ দিন
১০.	ড. এ.টি.এম. শামসুল হুদা	০৫.০২.২০০৭ থেকে ০৫.০২.২০১২	৫ বছর
১১.	কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ	০৯.০২.২০১২ থেকে বর্তমান	

সূত্র : Brig. Gen. (rtd.) Hussain, M. Sakhawat (2012), Electoral Reform in Bangladesh 1972-2008

নির্বাচন কমিশনারদের সংখ্যা, মেয়াদ ও তালিকা :

সারণি : ৩৭

নির্বাচন কমিশনারদের সংখ্যা, মেয়াদ ও তালিকা :

নং	**নাম**	**তারিখ**	**মেয়াদ**
১.	নূর মোহাম্মদ খান	০৭ জুলাই ১৯৭২ থেকে ৭ জুলাই ১৯৭৭	৫ বছর
২.	আব্দুল মুমিত চৌধুরী	২০ অক্টোবর ১৯৭৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৬	৮ বছর ২ মাস
৩.	বিচারপতি সুলতান হোসেন খান	১১ জানুয়ারি ১৯৮৭ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০	৩ বছর ১ মাস
৪.	বিচারপতি নাইম উদ্দিন আহমেদ	১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ থেকে ৪ এপ্রিল ১৯৯১	৩ মাস ১৫ দিন
৫.	বিচারপতি আমিন-উর-রহমান খান	১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ থেকে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯০	৯ দিন
৬.	বিচারপতি সৈয়দ মিসবাহ উদ্দিন হোসেন	২৮ ডিসেম্বর ১৯৯০ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪	৩ বছর ১ মাস ২ দিন
৭.	বিচারপতি মো. আব্দুল জলিল	৭ মে ১৯৯৪ থেকে ৯ এপ্রিল ১৯৯৬	২ বছর ১ মাস ২ দিন
৮.	আবিদুর রহমান	১৬ এপ্রিল ১৯৯৬ থেকে ১৬ এপ্রিল ২০০১	৫ বছর
৯.	মোশতাক আহমেদ চৌধুরী	১৬ এপ্রিল ১৯৯৬ থেকে ১৬ এপ্রিল ২০০১	৫ বছর
১০.	মো. শফিউর রহমান	২৫ জুন ২০০০ থেকে ২৫ জুন ২০০৫	৫ বছর
১১.	বিচারপতি এম মুন্সেফ আলী	১৯ এপ্রিল ২০০১ থেকে ১৯ এপ্রিল ২০০৬	৫ বছর
১২.	বিচারপতি কে এম মোহাম্মদ আলী	১৯ এপ্রিল ২০০১ থেকে ১৯ এপ্রিল ২০০৬	৫ বছর
১৩.	বিচারপতি মাহফুজুর রহমান	১৬ জানুয়ারি ২০০৬ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০০৭	১ বছর ১৫ দিন
১৪.	স ম জাকারিয়া	১৬ জানুয়ারি ২০০৬ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০০৭	১ বছর ১৫ দিন
১৫.	মো. হাসান মনসুর	৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০০৭	৪ মাস ২৭ দিন

১৬.	মোদাবিক্ষর হোসেন চৌধুরী	২৭ নভেম্বর ২০০৬ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০০৭	২ মাস ৪ দিন
১৭.	মো. সাইফুল আলম	২৭ নভেম্বর ২০০৬ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০০৭	২ মাস ৪ দিন
১৮.	মুহাম্মদ ছহুল হোসাইন	৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২	৫ বছর
১৯.	ব্রি. জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২	৫ বছর
২০.	মোহাম্মদ আব্দুল মোবারক	৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ থেকে বর্তমান	
২১.	মোহাম্মদ আবু হাফিজ	৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ থেকে বর্তমান	
২২.	ব্রি. জেনারেল (অব.) মো. জাবেদ আলী	৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ থেকে বর্তমান	
২৩.	মো. শাহ নেওয়াজ	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ থেকে বর্তমান	

সূত্র : Brig. Gen. (rtd.) Hussain, M. Sakhawat (2012), Electoral Reform in Bangladesh 1972-2008

পরিশিষ্ট তালিকা :

পরিশিষ্ট : ১

নির্বাচনের আগে ২০০৮ সালে নির্বাচন কমিশন থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রজ্ঞাপন
প্রকাশ করা হয়েছিলো; যেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট দের জন্য বিভিন্ন ধরনের নির্দেশিকা থাকে। নিম্মে তেমন একটি প্রজ্ঞাপন ও সেটিতে প্রকাশিত নির্দেশিকা হুবহু তুলে ধরা হলো।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ আশ্বিন ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৬৬-আইন/২০০৮ : স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৮২তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন : (১) এই বিধিমালা উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(ক) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে ।

২। সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) “নির্বাচন” অর্থ কোন উপজেলা চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচন বা মহিলা সদস্য পদে নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন;

(খ) “নির্বাচন-পূর্ব সময়” অর্থ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত সময়কাল;

(৫৭৭১) মূল্য ঃ টাকা ৪.০০ ৫৭৭২ বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০০৮।

(গ) “প্রার্থী” অর্থ কোন উপজেলা চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন এইরূপ যে কোন ব্যক্তি;

(ঘ) “সরকারি” অর্থ আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) “উপজেলা” অর্থ স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ)-এর অধীন গঠিত কোন স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ।

৩। কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান, ইত্যাদি প্রদান নিষিদ্ধ : কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকায় বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।

৪। সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ : কোন প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে।

(ক) সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো বা রেস্ট হাউজে অবস্থান করিতে পারিবেন না; এবং

(খ) সরকারী সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউস বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৫। নির্বাচনী প্রচার : নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে সকল প্রার্থী এবং প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ব্যক্তিগণকে বিধি ৬ হইতে বিধি ১৪ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

৬। সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ : নির্বাচনের উদ্দেশ্যে :

(ক) প্রচারের ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার থাকিবে এবং কোন প্রার্থী প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারকাজে বা উহাতে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না ;

(খ) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কেহ সভা আয়োজন করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার দিন, তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ পূর্বক অন্তত ২৪ ঘন্টা পূর্বে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে;

(গ) প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে কোন ব্যক্তি জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ কোন সড়কে জনসভা কিংবা পথসভা করিতে পারিবেন না; এবং বাংলাদেশ গেজেট।

(ঘ) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে সভা আয়োজনকারী পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন।

৭। পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ : (ক) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিম্নের উলিখিত স্থান বা যানবাহনে কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না, যথা :

(ক) উপজেলা এলাকায় অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুত ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দন্ডায়মান বস্তুতে;

(খ) উপজেলা এলাকায় অবস্থিত সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে; এবং

(গ) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহনে :

তবে শর্ত থাকে যে, উপজেলা এলাকাভুক্ত যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবেন;

(ঘ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না;

(ঙ) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন ২৩″×১৮″ এর অধিক হইতে পারিবে না এবং কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পোস্টারে তাহার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবেন না;

(চ) পোস্টারে ছাপানো ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমার ছবি কোন অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না;

(ছ) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আকার 23″×18″ এর অধিক হইতে পারিবে না; এবং

(জ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীকের আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কোন ক্রমেই তিন মিটারের অধিক হইতে পারিবে না। ৫৭৭৪ বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০০৮।

৮। যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ : কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে।

(ক) ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করা যাইবে না বা কোনরূপ শো-ডাউন করা যাইবে না;

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শো-ডাউন করা যাইবে না;

(গ) নির্বাচনী প্রচারকার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না; বা

(ঘ) নির্বাচনে শান্তি

শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রে নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালানো যাইবে না।

৯। দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ : কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি।

(ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; এবং

(খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ি বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক-দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থানে প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না।

১০। গেট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত
বাধা-নিষেধ : কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি।

(ক) নির্বাচনী প্রচারকালে কোন গেট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না বা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনী প্রচারের জন্য চারশত বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল তৈরী করিতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না; কোন প্রার্থী কোন ইউনিয়নে বা কোন পৌর এলাকায় একাধিক
নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস বা কোন উপজেলায় একাধিক কেন্দ্রীয় ক্যাম্প
বা অফিস স্থাপন কিংবা ঐ সমস্ত ক্যাম্পে বিনোদনের জন্য টেলিভিশন
বা ভিসিআর প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত,
সেপ্টেম্বর ১৮, ২০০৮ ৫৭৭৫।

(ঙ) নির্বাচনী প্রচারের জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা কোন ছবি বা চিহ্ন সম্বলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া, ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং

(চ) নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রদান করা যাইবে না।

১১। উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃংখল আচরণ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য বহন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ :

(ক) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি।

(অ) নির্বাচনী প্রচারকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানীমূলক কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এইরূপ কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না; এবং

(আ) মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচন উপলক্ষ্যে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করা যাইবে না; বা

(গ) নির্বাচনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানের মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যানবাহন চালানো এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং Arms Act, ১৯৭৮ এর সংজ্ঞায় উলিণ্ঢখিত অর্থে Fire Arms বা অন্য কোন Arms যেমন : বেয়নট, তলোয়ার, ছোড়া, চাপাতি, রামদা, চাইনিজ কুড়াল, বলণ্ঢম, তীর ধনুক, ইত্যাদি বা বিস্ফোরক দ্রব্য বহন বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

১২। প্রচারের সময় : কোন প্রার্থী, বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখের একুশ দিন সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

১৩। মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ : কোন প্রার্থী জনসভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে একই সংগে তিনটির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করিতে পারিবেন না, এবং লাউড স্পিকার বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর দুই ঘটিকা হইতে রাত্রি আট ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন। ৫৭৭৬ বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০০৮।

১৪। সরকারি সুবিধাভোগী কতিপয় ব্যক্তির নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ :

(ক) কোন সরকারি কর্মকর্তা কিংবা স্থানীয় প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি
নির্বাচনী কার্যক্রমে অবৈধ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না;

(খ) সরকারের কোন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, বা উক্ত মন্ত্রীগণের
পদমর্যাদা সম্পন্ন সরকারী সুবিধাভোগী কোন ব্যক্তি, উপজেলা পরিষদ
এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে নির্বাচনী প্রচার কাজে অংশগ্রহণ
করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার
ভোটার হইলে তিনি কেবল তাহার ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন;

(গ) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর উপজেলা পরিষদ এলাকায় কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কেহ নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা সরকারি যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং অন্য কোন সরকারী সুযোগ-সুবিধা ভোগ বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১৫। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার : ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি এবং ভোটারগণ প্রবেশ করিতে পারিবে।

১৬। বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ : কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৭। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল : (১) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড বা মৌখিক কিংবা লিখিত রিপোর্ট হইতে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লংঘনের চেষ্টা করিতেছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি চেয়ারম্যান, বা ভাইস-চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য পদের ক্ষেত্রমত, নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তদন্তের রিপোর্ট প্রাপ্তির পর নির্বাচন কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লংঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লংঘনের চেষ্টার জন্য তিনি চেয়ারম্যান, বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য পদে নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন,

Dhaka University Institutional Repository

তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবে। বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০০৮ ৫৭৭৭।

(৩) নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টকে এবং সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসারকে যথাশীঘ্র সম্ভব অবহিত করিবে।

(৪) নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৮। রহিতকরণ ও হেফাজত : (১) স্থানীয় সরকার, পলণ্টী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ২৪৭-আইন/৯৯/স্থাসবি/আইন-১/আর-৩/৯৯/৩৬৫, তারিখ ১৯ শে আগস্ট ১৯৯৯ খ্রিঃ মোতাবেক ৪ঠা ভাদ্র, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ দ্বারা জারীকৃত উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৯ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির, সচিব

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ২

বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেনের দায়ের করা মামলা

বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন যে মামলাটি দায়ের করেন তা উল্লেখ করা হলো :

বরাবর

বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট (নির্বাচনী অপরাধবিষয়ক)

বেলকুচি, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

বিষয় : বেলকুচি উপজেলার স্থগিত তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ২০০৯-এর কেন্দ্র সম্পর্কিত রিপোর্ট ছিনতাই এবং মারধরসহ আহতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

আমি মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ। অদ্য ২২ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখ বেলকুচি উপজেলার তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন স্থগিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে জনাব মো. হুমায়ুন কবির, জেলা প্রশাসক সিরাজগঞ্জ এবং জনাব মো. নাসির উদ্দিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারি রিটার্নিং অফিসার, তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ২০০৯, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ। মহোদয়গণের নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক স্থগিত নির্বাচনের মালামাল ও কেন্দ্র সম্পর্কিত রিপোর্টসমূহ জনাব মো. তৌহিদুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ এবং অফিস সহকারিদের নিয়ে গ্রহণ করছিলাম। মোট ৮১টি কেন্দ্রের মধ্যে ৭০টি কেন্দ্রের রিপোর্ট ও মালামাল গ্রহণ করার পরপরই বেলা আনুমানিক ২.৪৫ ঘটিকার সময়-

১. জনাব ফজলুল হক সরকার, পিতা: মৃত সিরাজ সরকার, সাং : শের নগর দক্ষিণপাড়া (প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী)
২. জনাব মো. আব্দুল মতিন প্রামাণিক, পিতা-দবির প্রামাণিক, সাং: গারামাসি (বর্তমান চেয়ারম্যান, ভাঙ্গাবাড়ি ইউনিয়ন)
৩. আব্দুল হামিদ আকন্দ, সাং: দেলুয়া (প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী) এদের নেতৃত্বে ও নির্দেশে এরাসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ও নাম না জানা আরো অনেকে আমাকে ও জনাব তৌহিদুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বেলকুচি সিরাজগঞ্জকে কিল, ঘুষি লাথি মেরে আহত করে রক্তাক্ত করে এবং প্রিসাইডিং অফিসারগণ কর্তৃক দাখিলকৃত কেন্দ্র সম্পর্কিত রিপোর্টসমূহ ছিনিয়ে নেয়। আক্রমনকারি ব্যক্তিরা হলেন :

১. ফজলুল হক সরকার, পিতা মৃত : সিরাজ সরকার, সাং: শেরনগর, দক্ষিণ পাড়া, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ
২. আব্দুল মতিন প্রামাণিক, পিতা : দবির প্রামাণিক, সাং : গাড়ামাসি, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ
৩. আব্দুল হামিদ আকন্দ, পিতা : সিকান্দার আলী আকন্দ, সাং: দেলুয়া উত্তর, বেলকুচি, সিরাজঞ্জ
৪. লুৎফর রহমান মাখন, পিতা : মৃত ওসমান গনি, সাং : বেড়া খাড়ুয়া, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ
৫. মোহাম্মদ আলী আকন্দ, পিতা : মৃত শামসুল হক আকন্দ, সাং: সমেশপুর, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ
৬. শামীম, পিতা : আব্দুল সালাম মন্ডল, সাং: দড়িয়াপুর, বেলকুচি, সিরাজঞ্জ
৭. মাজেদুল ইসলাম, পিতা : মোজাম্মেল হক, সাং: জিদুরি, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ
৮. সরোয়ার মেকার, পিতা : কোরবান খলিফা, সাং: শেরনগর মসজিদপাড়া, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

৯. আব্দুল মজিদ প্রামাণিক, পিতা : চাঁন মুহাম্মদ, সাং : মুকুন্দগাতি, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

১০. জাকারিয়া, পিতা : আলহাজ্ব সোনাউল্লাহ, সাং: চরচালা, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

১১. কাউসার, পিতা : আবদুল্লাহ, সাং: চালা আদালতপাড়া, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

১২. সাদ্দাম, পিতা : আসলাম, সাং : চালা আদালতপাড়া, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

১৩. বেলাল হোসেন, পিতা : মৃত আতিয়ার রহমান, সাং: চরচালা, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

১৪. সোহাগ, পিতা : শাহজাহান আলী মাস্টার, সাং : শেরনগর, পূর্বপাড়া, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

১৫. রেজা, পিতা : মোজাম্মেল হক, সাং : জিদুরি, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

১৬. হাবিবুর রহমান, পিতা : শামসুল, সাং: জিদুরি, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

১৭. সিরাজুল, পিতা : মোকসেদ, সাং : সূবর্ণপাড়া, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

১৮. ভূষণ, পিতা : মৃত : খোদা নেওয়াজ খান, সাং : চন্দনগাতি, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

১৯. আজগর আলী, পিতা : মৃত আব্দুল প্রামাণিক, সাং : চালা, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

২০. মক্কা সরদার, পিতা : মৃত সিরাজ উদ্দিন সরকার, সাং : শেরনগর , পূর্বপাড়া, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

২১. অলিভ, পিতা : আজিজুল হক, সাং : জিদুরি, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

২২. শুভ্র, পিতা : ফজলুল হক, সাং : শেরনগর, থানা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

২৩. মাজম, পিতা : জুড়ান মাহমুদ, সাং : চালা, উত্তর, উপজেলা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালতের নিকট ন্যায় বিচার প্রার্থণা করছি।

স্বাক্ষীগণ:

১. জনাব মো. নাসিরউদ্দিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
২. মো. তৌহিদুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
৩. মুহাম্মদ শহীদুল করিম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ

বিনীত
আপনার একান্ত অনুগত
মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
উপজেলা নির্বাচন অফিসার, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।
তারিখ : ২২ জানুয়ারি ২০০৯।

পরিশিষ্ট : ৩

মৎস্য ও পশু সম্পদমন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জ জেলা নির্বাচন অফিসার নীতিশ চন্দ্র দে'র দায়ের করা মামলা।

দ্বিতীয় মামলা : নির্বাচন কমিশনের সচিব মো. হুমায়ুন কবিরের নির্দেশে তৎকালীন সিরাজগঞ্জ জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা নীতিশ চন্দ্র দে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আচরণবিধি লংঘনের অভিযোগে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আরেকটি মামলা করেন। মামলার পিটিশন নম্বর : ছিলো ৩০/২০০৯।

বাদি : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নীতিশ চন্দ্র দে, জেলা নির্বাচন অফিসার-১, সিরাজগঞ্জ

বিবাদি :

৪. আব্দুল লতিফ বিশ্বাস এমপি, মৎস্য ও পশু সম্পদমন্ত্রী
৫. ফজলুল হক সরকার, প্রতিদ্বন্দ্বী উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
৬. আব্দুল হামিদ আকন্দ, প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
৭. আব্দুল মতিন প্রামাণিক, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাঙ্গাবাড়ি ইউনিয়ন, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
৮. সোমা বিশ্বাস, পিতা : আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, কামারপাড়া, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
৯. হিলটন, মৎস ও পশুসম্পদ মন্ত্রীর একান্ত সচিব ও
১০. আরো অনেকে।

স্বাক্ষী :

১. হুমায়ুন কবীর, জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ
২. আলমগীর রহমান, পুলিশ সুপার, সিরাজগঞ্জ
৩. মো. আব্দুল কাইউম, রিটার্নিং অফিসার ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সিরাজগঞ্জ
৪. নাসিরউদ্দিন, সহকারি রিটার্নিং অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিরাজগঞ্জ ও
৫. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ

সরকারপক্ষের আইনজীবী :

১. অ্যাডভোকেট শাকিল মোহাম্মদ শরিফুল হায়দার ওরফে রফিক সরকার

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট: ৪

সারণি : ৩৮

নির্বাচনী রোডম্যাপ ২০০৮ : নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

	জানু-মার্চ ২০০৭	এপ্রিল-জুন ২০০৭	জুলাই-সেপ্টে ২০০৭	অক্টো-ডিসে ২০০৭	জানু-মার্চ ২০০৮	এপ্রিল-জুন ২০০৮	জুলাই-সেপ্টে ২০০৮	অক্টো-ডিসে ২০০৮
ইসি পুনর্গঠন								
কমিশনারদের নিয়োগ								
সচিবালয় পুনর্গঠন								
নির্বাচনী সংস্কার								
সামাজিক সংলাপ								
সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সংলাপ								
রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ								
নির্বাচনী আইন সংশোধন								
ভোটার তালিকা প্রনয়ণ								
পদ্ধতি ও প্রযুক্তি নির্ধারণ								
পাইলট প্রজেক্ট								
যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন								

রোড ম্যাপের বাকি অংশ পরের পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

সফটওয়্যারের উন্নয়ন									
কর্মী নিয়োগ ও মোতায়েন									
গণনা ও ডাটা এন্ট্রি									
খসড়া তালিকা ছাপা, প্রকাশ ও সংশোধন									
চূড়ান্ত তালিকা ছাপা ও বিতরণ									
নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ									
সীমানা নির্ধারণ									
স্থানীয় নির্বাচন									
সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা									
নির্বাচন									
ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন									
উপজেলা পরিষদ নির্বাচন									
সংসদ নির্বাচন									
দল নির্বাচন									
তফসিল ঘোষণা ও নির্বাচন									

পরিশিষ্ট : ৫

সাক্ষাতকার :

নির্বাচনী আইন ও মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন : নবম জাতীয় সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের উপর একটি সমীক্ষা শিরোনামে গবেষণার কেস স্টাডির জন্য যাদের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে তারা হলেন :

১. ড. এ টি এম শামসুল হুদা, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার

২. মুহাম্মদ ছহুল হোসাইন, সাবেক নির্বাচন কমিশনার

৩. প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, চেয়ারম্যান, জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ, জানিপপ

৪. প্রয়াত মিজানুর রহমান খান দিপু, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনে আওয়ামী লীগের বিজয়ী প্রার্থী

৫. সাদেক হোসেন খোকা, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনে বিএনপিদলীয় পরাজিত প্রার্থী

৬. অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, নবম সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনে বিকল্পধারার পরাজিত প্রার্থী

৭. মো. হুমায়ুন কবির, সাবেক সচিব, নির্বাচন কমিশন

৮. বিশ্বাস লুৎফর রহমান, সাবেক যুগ্ম সচিব, নির্বাচন কমিশন

৯. রশিদ মিয়া, নির্বাচনী কর্মকর্তা, সূত্রাপুর থানা, ঢাকা

১০. হোসাইন জাকির, সাবেক বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক যুগান্তর ও বর্তমানে চিফ রিপোর্টার, আলোকিত বাংলাদেশ

১১. ফারুখ আহমেদ, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঢাকা-৬ আসনের ভোটার

১২. আফরোজা সুলতানা, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনের প্রিসাইডিং অফিসার

১৩. আব্দুল ওয়াদুদ, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনের প্রিসাইডিং অফিসার

১৪. মো. আলী আলম, তৃতীয় উপজেলা পরিষদে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে জামায়াত সমর্থিত বিজয়ী চেয়ারম্যান

১৫. ফজলুল হক সরকার, তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী

১৬. মফিজউদ্দিন খান লাল, তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী এবং বর্তমানে বেলকুচি পৌরসভা চেয়ারম্যান

১৭. ইমদাদুল হক এমদাদ, তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সমর্থিত পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী

১৮. আব্দুল হামিদ আকন্দ, তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিজয়ী ভাইস চেয়ারম্যান

১৯. আব্দুল খালেক তোতা, তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত পরাজিত ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী

২০. মোছাম্মত ছনিয়া সবুর, তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিজয়ী মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান

২১. ফ্লোরা বেগম, বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত পরাজিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী

২২. নিতিশ চন্দ্র দে, সাবেক জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা, সিরাজগঞ্জ

২৩. সাইফুল ইসলাম, সাবেক বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা ও বর্তমানে শেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা

২৪. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, সাবেক বেলকুচি উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা ও বর্তমানে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সহকারি সচিব

২৫. তৌহিদুল ইসলাম, বেলকুচির সাবেক শিক্ষা অফিসার ও বর্তমানে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার

২৬. সাইদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, বেলকুচি প্রেসক্লাব ও বেলকুচি সংবাদদাতা, দৈনিক ইত্তেফাক

২৭. গোলাম মোস্তফা রুবেল, বেলকুচি সংবাদদাতা, দৈনিক মানব জমিন ও মানবাধিকার সংগঠন অধিকার

২৮. সুকান্ত সেন, সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি, আরটিভি

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

নির্বাচনী আইন, বিধি-বিধান, রিপোর্ট ও ম্যানুয়াল :

১. পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০১২), নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

২. নির্বাচনী আইনের সংস্কার রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সংলাপের প্রতিবেদন (২০০৮), বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা।

৩. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৯১

৪. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিধিমালা, ১৯৯১

৫. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (সর্বশেষ সংশোধনী)

৬. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০৯

৭. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২

৮. নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮

৯. সংসদ সদস্য (বিরোধ নিষ্পত্তি) আইন, ১৯৮০

১০. সংসদীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮

১১. রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮

১২. রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনী)

১৩. ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯

১৪. ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন, ২০১০

১৫. ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২

১৬. জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা নির্বাচন আইন, ২০০৪

১৭. নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯

১৮. জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০

১৯. জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০

২০. স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থীতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১

২১. সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০০৮

২২. সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা (সংশোধিত), ২০০৮

২৩. উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩

২৪. স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮

২৫. উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০০৮

২৬. সীমানা পুন:নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬

২৭. জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুন:নির্ধারণ, ২০১৩

২৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী), অক্টোবর ২০১১।

বই :

- রশিদ, হারুন-অর (২০১৩), *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউএজ পাবলিকেশন, ঢাকা।
- হাননান, মোহাম্মদ (২০১২), *বাঙালির ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
- কাওছার, এডভোকেট এবিএম রিয়াজুল কবীর কাওছার (২০১২), *বাংলাদেশ নির্বাচন জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, জেলা উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০১২)*, বাংলাদেশ নির্বাচন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা।
- গাইন, ফি. (সম্পাদিত) (২০০৮) *সাংবাদিক সহায়িকা তথ্যপঞ্জী নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের পটভূমি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য;* সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা।
- আরেফিন, এএসএম সামছুল (২০১১), *বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০৮*, বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশনন্স, ঢাকা।
- আহাদ, অলি (২০০৪), *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. ঢাকা, চট্টগ্রাম।
- আহমেদ, তোফায়েল (২০১১), *বৃত্ত ও বৃত্তান্ত বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় শাসন, রাজনীতি ও উন্নয়ন ভাবনা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
- হক, আবুল ফজল (২০১০), *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা।
- রশিদ, হারুন-অর (২০০৯), *বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ (১৮৬১-২০০৮*), হাসিনা প্রকাশনা, ঢাকা।
- হোসেন, এম সাখাওয়াত (২০১৪), *বাংলাদেশে নির্বাচনী সংস্কার ১৯৭২-২০০৮*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।
- আহমেদ, সিরাজ উদ্দীন, ২০১৩, *শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, বরিশাল।
- ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল (১৯৯৭), *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, ঢাকা।
- চৌধুরী, মিজানুর রহমান, *রাজনীতির তিনকাল* (২০০৩), অনন্যা, ঢাকা।
- মুরশিদ, গোলাম (২০১২), *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর প্রকাশন, ঢাকা।
- আহমেদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (২০০১) খোশরোজ কিতাবমহল, ঢাকা।
- হাসানুজ্জামান, আল মাসুদ (২০০৯), *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।
- শিকদার, আব্দুর রব, *বাংলাদেশ নবম জাতীয় সংসদ ২০০৯-২০১৪*, (২০১২) আগন্তুক প্রকাশনী, ঢাকা।
- হাননান, মোহাম্মদ (২০০০), *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস এরশাদের সময়কাল*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
- রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (২০১৩), *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- হোসেন, আবু মোঃ দেলোয়ার (২০১৩), *বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৯০৫-১৯৭১*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা।
- খান, তারিক হোসেন (২০১৩), *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা।
- আহমেদ, সিরাজউদ্দীন (১৯৯৭), *হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা।
- চৌধুরী, মিজানুর রহমান, (২০০১), *রাজনীতির তিনকাল*, অনন্যা, ঢাকা।
- খান, আতাউর রহমান (২০০০), *প্রধানমন্ত্রীত্বের নয় মাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

- হাননান, মোহাম্মদ (২০০০), *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর সময়কাল*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
- ইসলাম, নজরুল (২০১৩), *আগামী দিনের বাংলাদেশ ও জাসদের রাজনীতি*, অনন্যা, ঢাকা।
- ত্রিপাঠী, অমলেশ (২০১৩), *নেতা থেকে নেতাজী, সম্পাদনা শেখ রফিক*, বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা, ঢাকা।
- দত্ত, কল্পনা (জোশী) (১৯৪৬), *চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমনকারীদের স্মৃতিকথা*, নববিধান প্রেস, কলকাতা।
- হোসেন, হোসেনউদ্দীন (২০০৯), *বাঙলার বিদ্রোহ (৬০০-১৯৪৭)*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা।
- হাননান, মোহাম্মদ (২০০০), *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর সময়কাল*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
- উমর, বদরুদ্দীন (২০১১), *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*-৩, সুবর্ণ প্রকাশন, ঢাকা।
- আখতার , মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (২০০৯), *অভিনব সরকার ব্যতিক্রমী নির্বাচন*; এএইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।
- মজুমদার, রমেশ চন্দ্র (২০১৩), *বাংলা দেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ*, প্রথম খন্ড, কলিকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা :

প্রথম আলো, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭
ইউএনবি, ২৩ জানুয়ারি ২০০৯
সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ২৯ মার্চ ১৯৯০
প্রথম আলো, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮
সমকাল, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮
যুগান্তর, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮
ইত্তেফাক, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮
নয়াদিগন্ত, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮
প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি ২০০৯
যুগান্তর, ২৩ জানুয়ারি ২০০৯
সমকাল, ২৩ জানুয়ারি ২০০৯
আমার দেশ, ৭ এপ্রিল ২০০৯
প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০০৯
সমকাল, ৭ এপ্রিল ২০০৯
যুগান্তর, ৭ এপ্রিল ২০০৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ এপ্রিল ২০০৯
Weekly Holiday, March 30 1990
The Daily Star, 9 April 2008
bdnews24.com, 16 September 2008
The Daily Star, 30 December 2008
The New Age, 30 December 2008
The Daily Star online report 22 January 2009
The Financial Express, 23 January 2009
The Daily Star, 23 January 2009
The New Age, 23 January 2009
bdnews24.com, 5 February 2009
The Daily Star, 7 April 2009
The Independent, 7 April 2009

জার্নাল/রিপোর্ট :

- Report on the first General Election to Parliament in Bangladesh 1973 (1973), Bangladesh Election Commission. Dhaka.
- Report on Parliamentary Election 1979, Bangladesh Election Commission, Dhaka.
- Report on Parliamentary Election 1988, Bangladesh Election Commission, Dhaka.
- Eicher et al (2010), Elections in Bangladesh 2006-2008 Transforming Failure into Success, UNDP, Dhaka.

ওয়েব সাইট :

- নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইট
  http://www.ecs.gov.bd/Bangla/MenuTemplate1.php?Parameter_MenuID=12&ByDate=0&Year=
- http://www.ecs.gov.bd/Bangla/MenuTemplate1.php?Parameter_MenuID=9&ByDate=0&Year=
- http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladeshi_general_election,_2008
- http://bn.wikipedia.org/wiki